

ছোটবেলায় শোনা স্বর্ণ সময়।

এ তো মনের গভীরে প্রোথিত। বাণীকুমারের রচনা। সংগীত পরিচালনায় খ্যাতনামা সংগীত শিল্পী পঙ্কজকুমার মল্লিক। এ লেখাটা যখন লিখছি মহালয়ার দশদিন আগে। সে সময় রেডিওতে রেডিওতে বাড়ি, বাড়ি থেকে পাড়া, পাড়া থেকে অঞ্চলের পর রাজপাড়া থেকে অঞ্চলের পর রাজ্য ঘুম ভেঙে মোহিত হয়ে শুনছে শ্লোক পাঠ ও মনকে আনন্দভ্রমণে নিয়ে যাওয়া সেইসব গান। যা চণ্ডী, বাজলো তোমার আলোর বেণু, জাগো দুর্গা দশপ্রহরধারিণী, ওগো আমার আগমনী আলো, তব অচিন্ত্য রূপ-চিরত-মহিমা, অখিল-বিমানে তব জয় গানে, জয়ন্তী মঙ্গলা কালী, শুভ শঙ্খ রবে, নম চণ্ডী নম চণ্ডী, মাগো তব বিনে সংগীত, বিমানে বিমানে আলোকের গানে, হে চিন্ময়ী, অমল কিরণে ত্রিভুবন মনোহারিণী, শক্তি দিলে ভরি। কত খ্যাতনামা শিল্পীর সমন্বয়ে এই রকম একটা কালজয়ী অনুষ্ঠান সফল হয়ে ওঠে। তখন প্রতিমা হতো একচালার।

মানে একটা চালচিত্রের মধ্যেই দুই ছেলে মেয়েকে নিয়ে দেবী দুর্গা। জ্ঞান হবার পর থেকে অনেক বছর দেখেছি টিন দিয়ে ঘিরে পূজামণ্ডপ। মাথায়ও টিন। প্রতিমার মাথার উপর থাকত শামিয়ানা। চারদিকে দড়ি দিয়ে বাঁধা। তার গায়ে সুতো বা কপড় কেটে নান রকমের কাজ করা থাকত। আমরা ছোটো বার বার দেখতাম। ঢাকের সামনে ঘুরঘুর করা তো লেগেই থাকত। মনে মনে ঢাকে কাঠি মারার ইচ্ছেও জাগত। সাহসের অভাব। চাইলে ঢাকিওলা কাঁসর বাজাতে দিত। ভারের জন্য বেশিক্ষণ হাতে রাখা যেত না। মাইকের অত চল ছিল না। ঢাকের শব্দ কানে গেলে আবার দৌড় মগুপে। একটু একটু সময় এগোয়। টিনের বদলে বাঁশ, বাঁশের গায়ে কাপড় উঠল। কপড়ের কুচি করে মগুপসজ্জা শুরু হলো। তারপর কাঠের বাটাম এল। এখন থিম। মন্ডপ, প্রতিমা সব। সেই প্রাণ আর পাই না। সবটাই কেমন যেন ওপর ওপর।

-----○-----



PERTH AUTOMOTIVE SOLUTION
MOBILE MECHANIC SERVICES: WE COME TO YOU AND DO THE NECESSARY REPAIR FOR YOUR CAR.

South of the river location (Thornlie). Booking essential

For booking call NAZRUL on 0466 044 766

Or Email to: service@pasolutions.com.au

WE PROVIDE MOBILE AUTOMOTIVE MECHANIC SERVICE AT YOUR DOOR STEP FOR YOUR VEHICLE SERVICING AND MAINTENANCE NEED. PERTH AUTOMOTIVE SOLUTIONS IS WA'S LICENSED REPAIRER RUN BY QUALIFIED AND INDUSTRY EXPERIENCED ENGINEERS AND TECHNICIANS.



বন্ধন

BANDHAN

সংকলন ২০১৮, অষ্টমসংখ্যা
Magazine 2018, Issue 8
আশ্বিন ১৪২৫,
October 2018

বন্ধন পরিষদ

উত্তম দেওয়ানজী
শর্মিষ্ঠা সাহা
বিশ্বজিৎ বসু

Bandhan Committee

Uttam Dewanjee
Sharmistha Saha
Biswojit Bose

প্রচ্ছদ

শর্মিষ্ঠা সাহা

Cover Design

Sharmistha saha

অঙ্কর বিন্যাস

বিশ্বজিৎ বসু

Page Makeup

Biswojit Bose

Acknowledgement

Gautam Sharma
Saumitra Seal
Manonita Ghosh
Prabir Sarker
Balaram Das
Rupam Barua
Partha Sarathi Deb
Ashish Kumar Saha

প্রকাশক :

দি বাঙালি সোসাইটি ফর পূজা
এন্ড কালচার, অস্ট্রেলিয়া।

Publisher:

The Bangali Society for
Puja and Culture (BSPC)
Inc. WA, Australia.

বিঃদ্রঃ লেখকের মতামতের জন্য
সম্পাদক বা প্রকাশক দায়ী নয়।

সম্পাদকীয়

দুর্গাপূজা সমগ্র হিন্দু সমাজে প্রচলিত একটি ধর্মীয় উৎসব। তবে বাঙালী হিন্দু সমাজে এটি অন্যতম বিশেষ ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব। আশ্বিন বা চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষে দুর্গাপূজা করা হয়। আশ্বিন মাসের দুর্গাপূজা শারদীয় দুর্গাপূজা এবং চৈত্র মাসের দুর্গাপূজা বাসন্তী পূজা নামে পরিচিত। আশ্বিন মাসের দুর্গাপূজার জনপ্রিয়তা বেশী। বাঙালী হিন্দু সমাজের প্রধান ধর্মীয় উৎসব হওয়ায় দুর্গাপূজা বিশেষ জাঁকজমকের সঙ্গে পালিত হয়। প্রবাসে বসবাসরত বাঙালীরাও প্রথা অনুযায়ী এ উৎসবের আয়োজন করে থাকে। এ উৎসব প্রকৃত অর্থেই জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মিলনমেলা। প্রতি বছর মায়ের পদতলে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদনের মাধ্যমে বিশ্ব সমাজের শান্তি ও চিরমঙ্গল কামনা করতে আমরা মিলিত হই এই দিনে। প্রায় এক দশকের ও বেশী সময় ধরে চলে আসা পূজা উৎযাপনের ধারাবাহিকতায় প্রতিবারের মত এবারও বাঙালী সোসাইটি ফর পূজা এন্ড কালচার ইনক। (BSPCI) অস্ট্রেলিয়ার পার্থে আয়োজন করেছে শারদীয় দুর্গাপূজার। মায়ের আগমন আমাদের যাবতীয় দুঃখ কষ্ট দূর করে সবার জীবনকে শান্তিময় ও কল্যাণকর করবে- এটাই প্রার্থনা। প্রবাসী দুর্গোৎসবের বাড়তি মাত্রা যোগ করতে এবারও প্রকাশিত হতে যাচ্ছে ম্যাগাজিন "বন্ধন"। "বন্ধন" প্রকাশনার এবারের আয়োজনের সংগে সংশ্লিষ্ট লেখক লেখিকা, বিজ্ঞাপনদাতা, কারিগরি সহায়ক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন। "বন্ধন" সংখ্যা উৎসবের বাড়তি মাত্রা যোগ করলেই আমাদের প্রয়াস সার্থক হবে।

- উত্তম দেওয়ানজী, সম্পাদক

The Bangali Society for Puja and Culture Inc. (BSPC), WA

Executive Committee 2016-2017

President	: Biswojit Bose
General Secretary	: Partha Sharathi Deb
Assist General Secretary	: Rupam Barua
Treasurer	: Subrata Saha
Cultural Secretary	: Sangita Saha
Assit. Cultural Secrerary	: Saptahrshi Seal
Publication Secretary	: Uttam Dewanjee
Religious Secretary	: Gargee Sarker
Members	: Gautom Sharma : Prabir Sarker : Chanchala Rani Das : Utpal Bhattacharjee : Tanmoy Debnath

দুর্গা পূজা এবং আমার দেখা

- নরেশ মণ্ডল

বারো মাসে তেরো পার্বণ। কথাটা শুনেছেন। আমিও। উৎসবের আধিক্য। এখন বাংলা ১৪২৫। ইংরেজির ২০১৮। এই সময়ে দাঁড়িয়ে কথাটা আরও বেশি প্রসঙ্গিক বলেই আমার মনে হয়। আমি যেখানে থাকি বর্তমান সময়ের বছর কয়েক চলছে নানা বর্ণময় উৎসব। অনেকটা মাটিতে বল পড়তে না দেওয়ার মতো। যা পাও এখানে তাই নিয়েই নতুন নতুন উৎসব। ঘাস, মাটি, মাছ থেকে মায় গণেশও ইদানীং আরও কিছু যোগ হয়ে পথে বর্ণময় হয়ে উঠেছে। এক অসুস্থ প্রাণহীন প্রতিযোগিতা। সময় বদলের সঙ্গে মননের যেন রং ফিকে হয়ে যাচ্ছে। আমাদের ছোটবেলা মোবাইল, কম্পিউটার দিয়ে শুরু ছিল না। ছিল রেডিও। মাইকের চলও তেমন ছিল না। শারদোৎসব থেকে নানা পুজায় ঢাকের বাদ্যি, কাঁসর, ঘণ্টা। সানাই, বাঁশিও শুনেছি। অবশ্য পরবর্তী সময়ে মাইকে শুনতাম বিখ্যাত শিল্পীদের মন মাতানো গান। যা আজও কোথাও শুনলে মন শুন শুন করে। এখন মাইকের সঙ্গে ডিজে। অত্যাধুনিকতার প্রভাব। নতুন আবিষ্কার তার উপযুক্ত ব্যবহার সব সময় ভালো। অপব্যবহার? সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখের যায়গায় মন ভোলানো সাময়িক উৎসব রঙের ছোঁয়া মাত্র। যার প্রভাব মনের মধ্যে কখনও সাড়া জাগায় না। একটা সময় ছিল দড়ি বাঁধা হাঁটু পর্যন্ত প্যান্ট, হাত কাটা গেঞ্জি, সাদামাট জামা। এক ঢালের ফ্রক, টেপজামা মেয়েদের। কারো যদি ফুল প্যাতন্ট হতো তার তো আনন্দের সীমা নেই।

মনে আছে বাবা রাতে কাজ সেরে ফিরে এসেছেন। এনেছে নতুন চটি, জামা। ঘুম চোখে সেগুলো হাতে নিয়ে নিজের শোবার যায়গায় রেখে দেওয়া। কেউ যেন আগে না ধরে।দুর্গা পূজা বা শারদোৎসবে নতুন জামা পাওয়ায় যে আনন্দ আমরা পেতাম এখনকার প্রজন্ম তার ধারে কাছেও নেই। এরা কেমন যেন আত্মকেন্দ্রিক। নিজের নিজের বন্ধুদের মধ্যেই ওঠা বসা। সদ্য কলেজে পা দিয়েছি।মনটা কেমন যেন বেড়াই বেড়াই করছে।যাই কোথায়। লেখার সূত্রে বাইরের কিছু বাঙালি বন্ধু হয়ে গেছে। ওরা কলকাতায় আসতো পত্রিকা ছাপতো। আমার যাবার ইচ্ছের কথা শুনে উৎসাহে জানালো আহ্বান। হরিয়ানায় এক আত্মীয়র সন্ধান মিলল। ব্যপারটা বেশ জমে উঠল। মন পালাই পালাই করছে।অল্প রেশ্ন নিয়ে সওয়ারী হয়ে বসলাম ট্রেনে। উৎসবের মেজাজ চারদিকে। দশেরা। ভাষার এবং অভিজ্ঞতার অভাব। বেশ নাকাল হতে হলো। যে ট্রেনে উঠলাম সেটা হরিয়ানায় যায় না। দিল্লি থকে উল্টো ট্রেনে। ঠাসা ভিড়। কোন রকমে দাঁড়ানো। সবাই বাড়ি ফিরছে ছুটিতে। স্টেশন আসতে নামার উপায় কি। সাথে সূটকেস। দরজা খোলার কোন উপায় নেই। দরজার কাচের সাটারটা খুলে কোন রকমে পাদনিতে পা দিয়ে ট্রেন লাইনে ঝাঁপ, এক সহৃদয় পাঞ্জাবী ভদ্রলোক জানলা দিয়ে সূটকেসটা নামিয়েদেন। আধো অন্ধকারে ট্রেনের জানলা থেকে বেরনো আলোয় সামনের দিক দিয়ে স্টেশনে উঠলাম। ঠিক ট্রেনের সমনে দিয়ে। ট্রেন ছেড়ে দিলে আজ আর এ লেখা হতো না। আমার জীবনে একটা স্মরণীয় ঘটনা।

কয়েকদিন ভাইঝি-জামাইয়ের সঙ্গে নানা সেস্টরে ঘুরে দুর্গা প্রতিমা দর্শন করা খুব আনন্দের ছিল। ওখানকার ভিড় পরিবেশ আলাদা। পুজাকে কেন্দ্র করে আড্ডা খাওয়া। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। একদিন দিল্লিতে গেলাম প্রতিমা দেখতে। কিছু যায়গা ঘুরে স্থির হলাম চিত্তরঞ্জন পার্কে। বাঙালি অধ্যুষিত। অন্যরাও আছেন। খাওয়া সেরে বসে পড়লাম সিনেমা দেখতে। নানা অনুষ্ঠানের পর রতের দিকে দেখানো হয় বাংলা সিনেমা। লালপাথর হচ্ছে। যখন শেষ হলো দিনের আলো ফুটতে শুরু করেছে। আড়মোড়া ভেঙে ক্লান্তি আমায় ক্ষমা কর, বলে বাসস্ট্যাখন্ডের উদ্দেশ্যে রওনা। হাঁটতে বেশ লাগছিল। সাজানো শহর। বেশ ঠান্ডা ভাব। সাইকেল থেকে কাগজ ছুঁড়ে দিচ্ছে বাড়িতে। কখনও দূ তলায়।একটা চায়ের দোকান থেকে গরম চা বেশ আরামদাবক হলো।

বিসর্জনের দিন কয়েজনের সঙ্গে লরিতে করে প্রতিমা নিরঞ্জে দিল্লি গেলাম। যমুনা নদীতে বিসর্জন। মাইকে ঘোষণা অনুসারে এক একটা অঞ্চলের গাড়ি দাঁড়াবার সুন্দর ব্যবস্থা। ঘোষণা অনুযায়ী প্রতিমা যাচ্ছে। ধুনুচি নাচ। ছেলেদের থেকে মেয়েদের উৎসাহ দেখলাম আরও বেশি। বাংলার বাইরে এই দুর্গোৎসব অন্য মাত্রা যোগ করে। এক ঘেয়ে জীবনের বাইরে এই কটা দিন যেন মন প্রজাপতি হয়ে ঘুরেবেড়ায়। লিটল ম্যাগাজিনও বের হয়।একবার নৌকায় যমুনা নদীতে একটু ঘুরে নিলাম। লালকেল্লার ছায়া পড়েছে। কেল্লাটা দেখে যেমন আনন্দ হলো তেমনই এক বিষণ্ণতা। লক্ষ্মী পূর্ণমার দিন সঙ্গীহীন হয়ে বেরিয়ে পড়লাম তাজমহলের উদ্দেশ্যে। সারাটা রাত তাজমহলকে দেখলাম। অপূর্ব সে দেখা। নিঃসঙ্গতা যেন ইতিহাসের কথায় আনমনা করে তুলছিল। পাশ দিয়ে বয়ে গেছে যমুনা। দূরে আগ্রা ফোর্ট। বন্দি শাহজাহান যেখান থেকে তাঁর সাধের তাজ দেখতেন। ফোর্টের গবাক্ষ দিয়ে আমিও তাজকে দেখেছি। বেদনাময় এক অনুভূতি।

কানপুরে কয়েকটা দিন এ ওর বাড়ি থাকা। ওখানে নাট্যোৎসব হয়। কলকাতা থেকে বিশিষ্টজনেরা যান। কয়েকটা নাটক দেখার সুযোগও হলো। এক বন্ধুর সঙ্গে লঞ্জে। প্রাচীন স্থাপত্য দেখা। অবাক করা কাজ। মেঘেদের আনাগোনা। পৈঁজা তুলোর মতো সাদা। উদ্যোধ্যহীন ভাবে মনের আনন্দে ওদের ঘুরে বেড়ানো দেখতাম। তখনতো আকাশটা ছিল অনেক অনেক বড়। গগনচুম্বী বাড়ির ছিল না এমন দাপটে মাথা তোলা। মনও কখন যেন সওয়ার হতো মেঘের ভেলায়।

একটা হিমেল পরশ যেন ছুঁয়ে থাকত। শিউলির মেলা গাছতলায়।হালকা শিশিরে ভেজানো পা। বুক ভরা আনন্দময় বাতাস। মাঠময় কাশবন। ছুটে যাচ্ছে দুর্গা সঙ্গে অপু। চোখের সামনে আজও ভাসে সেই সেই দৃশ্য। যা বিশ্বশ্রেষ্ঠ অন্যতম চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের ‘পথের পাঁচালী’। শরতের আকাশ বাতাস মুখরিত হতো যে কণ্ঠস্বর আর অনুষ্ঠানে তা ভোলার নয়। যে একবার শুনেছে তা যেখানেই থাকুন না ওই কণ্ঠস্বর আর গানগুলো স্মৃতির মণিকোঠা থেকে উঠে আসবেই। দেবীপঙ্কের সূচনা হয় এই মহালয়া থেকে। ‘‘মহিষাসুরমর্দিনী’’’। গ্রন্থনা ও শ্লোক পাঠ করেছেন সেই বিরল কণ্ঠের অধিকারী বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র।তাঁর কণ্ঠস্বর যে দেশেই বাজুক না কেন কোন বাঙালি থাকলে তিনি পৌঁছে যাবেন তাঁর

: সূচীপত্র :

১. পুরাণ সূত্র, বিশ্বজিতবসু
২. মিনিগল্ল: সুপ্ত শব্দ, কমলেশ রায়
৩. অহঙ্কারের উত্থান, ডঃ অসিত সাহা
৪. কোথা থেকে এলো কোলকাতা, আজিজ ইসলাম
৫. স্বপ্ন প্রতিমা, শর্মিষ্ঠা সাহা
৬. এসো মা দুর্গা, অমরনাথ চক্রবর্তি
৭. Hinduism, *PrasunSarker*
৮. Operation Riverside, Prithul Bisshay
৯. I Don’t Know, Gourab Sharma
১০. Chittuargrh Fort, Ananyina Sharma
১১. The Power of Girls, Riana Debnath
১২. The Unknown Present, Adipta Dewanjee (Ushno)
১৩. My Brother, Promiti Sarker
১৪. *Seat 13, Rijuta Das*
১৫. Silence, Promiti Sarker
১৬. ট্রেকিং অভিজ্ঞতা – মাউন্ট এভারেস্ট বেসক্যাম্প, সাব্বির হোসেন
১৭. তৃতীয় লিঙ্গ, সোনালী সরকার
১৮. মা, ইঞ্জিনিয়ার মনোরঞ্জন গোস্বামী
১৯. ওড়া শেখা হল না, ইন্দিরা চন্দ
২০. অনুরাধা মুখোপাধ্যায়ের কবিতা
২১. মা দুর্গাকে নিয়ে গীতিকবিতা, তপন বাগচী
২২. ভালো থাক সবুজ পাসপোর্টেরা, শরিফা টুলটুলী
২৩. অনুগল্ল: দীপা, আশিক বিশ্বাস
২৪. পাথর সময়, নাসরীন মুস্তাফা
২৫. দুর্গা পূজা এবং আমার দেখা, নরেশ মণ্ডল



পুরাণ সূত্র

- বিশ্বজিৎ বসু

পৃথিবী এবং মানব সৃষ্টি কিভাবে হয়েছিল তা নিয়ে ধর্ম, গোত্র ভেদে এর রয়েছে নানা রকম মিথ, নানা রকম বিশ্বাস। এ নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণাও চলছে নিরন্তর। অন্যান্য ধর্ম বিশ্বাস কিম্বা মিথের মত সনাতন ধর্মেও আছে পৃথিবী সৃষ্টি এবং সভ্যতার সূত্রপাত তত্ত্ব। যা অনেকটা আধুনিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার কাছাকাছি। সেখানে পূর্বকল্প এবং মহাপ্রলয়ের কথা উল্লেখ পাওয়া যায়।

সনাতন ধর্মের মূল ধর্মগ্রন্থ বেদ। চার বেদের প্রথমটি ঋক বেদ। ঋকবেদ সূত্রে ঈশ্বর 'একমেবাদ্বিতীয়ম'। তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। ঈশ্বর বা ব্রহ্ম (ব্রহ্মা নন) সম্পর্কে আরও বলা হয়, 'অবাংমনসগোচর, অর্থাৎ ঈশ্বরকে কথা (বাক), মন বা চোখ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না, তিনি বাহ্য জগতের অতীত। আরও বলা আছে 'একং সদ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'। অর্থাৎ সেই এক ঈশ্বরকে পণ্ডিতগণ বহু নামে বলে থাকেন।

'একং সন্তং বহুধন কল্পামন্তি, অর্থাৎ সেই এক ঈশ্বরকে বহুরূপে কল্পনা করা হয়েছে। 'দেবানাং পূর্বে যুগে হসতঃ সদা জায়ত,। অর্থাৎ দেবতারও পূর্বে সেই অব্যক্ত (ঈশ্বর) হতে ব্যক্ত জগৎ উৎপন্ন হয়েছে। তিনি সৃষ্টি ও স্থূল সকল কিছুই উৎস।

ঈশ্বরকে বলা হয় নির্গুণ অর্থাৎ জগতের সবগুণের আধার তিনি। আবার ঈশ্বর সগুণও কারণ তিনি চাইলেই যে কোন গুণের অধিকারী হতে পারেন এবং সেইগুণের প্রকাশ তিনি ঘটাতে পারেন। দেব দেবীগণ ঈশ্বরের এই সগুণের প্রকাশ। অর্থাৎ ঈশ্বরের এক একটি গুণের সাকার প্রকাশই দেবতা।

সনাতন ধর্মমতে মহাপ্রলয়ের মাধ্যমে শুরু হয় ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি। ব্রহ্ম হতে উৎপন্ন বিধায় ইহা ব্রহ্মাণ্ড। মহাপ্রলয়ের পূর্বের অবস্থাকে বলা হয় পূর্বকল্প। পূর্বকল্প অবসানের পরই ঘটে মহাপ্রলয়। মহাপ্রলয়ের পর জগত কারণসলিলে পরিণত হয়। ঈশ্বর অখিল শক্তির প্রভাব বিস্তার করে নারায়ণ রূপে কারণ সলিলে যোগনিদ্রায় অনন্ত শয়নে শায়িত হন। হঠাৎ তাঁর ইচ্ছে হলো তিনি এক থেকে বহু হবেন: 'একোহং বহুশ্যাম', 'আমি এক থেকে বহু হব। এখানেই সৃষ্টি কল্পের শুরু।

সৃষ্টি কল্পের শুরুতে ঈশ্বর নিজেকে পুরুষ এবং প্রকৃতি রূপে দ্বিধা বিভক্ত করেন। পরম পুরুষরূপে সৃজনী শক্তিরূপী প্রকৃতিকে সৃষ্টির প্রেরণা জোগাতে থাকেন। এরপর তিনি নিজের সত্তাকে সত্ত্ব গুণান্বিত বিষ্ণু, রজো গুণান্বিত ব্রহ্মা এবং তমো গুণান্বিত রুদ্র বা শিব এই তিনভাগে বিভক্ত করেন। বিষ্ণুর নাতী পদ্ম থেকে জন্ম নেন ব্রহ্মা, চোখের রুদ্র থেকে জন্ম নেন শিব। ব্রহ্মা হিসাবে তিনি দায়ীত্ব নেন সৃষ্টির, বিষ্ণু হিসাবে তিনি দায়ীত্ব নেন সৃষ্টিরক্ষার আর শিব হিসাবে তিনি দায়ীত্ব নেন সংহারের।

ঈশ উপনিষদে বলা হয়েছে

ওঁ পূর্ণ মদঃ পূর্ণ মিদং পূর্ণাৎ পূর্ণ মুদচ্যতে।

পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণ মেবাব শিষ্যতে।।

অর্থাৎ "উহা (পরব্রহ্ম) পূর্ণ, ইহা (নামরূপে স্থিতব্রহ্ম) পূর্ণ; সকল সৃষ্টি ও স্থূল পদার্থ পরিপূর্ণ ব্রহ্ম হতে উদগত বা অভিব্যক্ত। আর

সেই পূর্ণ স্বভাব ব্রহ্ম হতে পূর্ণত্ব গ্রহণ করলেও পূর্ণই অর্থাৎ পরব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন। ঈশ উপনিষদে বলা হয়েছে ব্রহ্ম অদ্বিতীয়সত্তা। এই উৎস থেকে জগতের বিভিন্ন উপকরণের সৃষ্টি হয়।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ অনুসারে ব্রহ্ম অব্যক্ত, যার স্বরূপ জানা যায়না, যা চিরকাল আছে এবং যার বিনাশনেই, সেই ব্রহ্ম সবার আগে বিরাজমান থাকেন। ঋষিরা যাকে বলেন প্রকৃতি। যার ক্ষয় নেই বা জীর্ণ হয়না, রূপ রস গন্ধ শব্দ ও স্পর্শহীন, যার আদি নেই, অন্ত নেই। সেই ব্রহ্ম থেকে জগতের উদ্ভব হয়েছে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ অনুযায়ী সত্ত্ব (প্রকৃতি) রজ (যার প্রভাবে অহংকারসহ অন্যান্য মন্দ গুণের জন্ম হয়) ও তম (অন্ধকার) এই তিনগুণ তাঁর মধ্যে পরস্পরের অনুকূলেও অব্যাহাতে অধিষ্ঠিত আছে। সৃষ্টির সময়ে ব্রহ্ম এই তিন গুণের সাহায্যে সৃষ্টি ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হলে প্রধান তত্ত্ব প্রাদুর্ভূত হয়ে মহৎতত্ত্বকে (মহৎ নামক তত্ত্ব) আবৃত করে। এই মহৎতত্ত্ব তিনগুণের ভেদে তিন প্রকার। এর থেকে তিন প্রকার মহৎতত্ত্ব হতে ত্রিবিধ অহঙ্কার প্রাদুর্ভূত হয়। এই ত্রিবিধ অহঙ্কারগুলো আবার মহৎতত্ত্বদ্বারা আবৃত থাকে এবং মহৎতত্ত্বের প্রভাবে বিকৃত হয়ে শব্দ তন্মাত্রের সৃষ্টি করে।

শব্দ তন্মাত্র থেকেই শব্দ লক্ষণ আকাশের জন্ম। রজগুণ হতে সৃষ্ট অহঙ্কার শব্দ মাত্র আকাশকে আবৃত করে এবং তার প্রভাবে স্পর্শ তন্মাত্রের জন্ম। এই স্পর্শ তন্মাত্র থেকে বলবান বায়ু প্রাদুর্ভূত হয়। সেজন্য স্পর্শই বায়ুরগুণ। শব্দমাত্র আকাশ যখন স্পর্শ মাত্রকে আবৃত করে, তখন বায়ু বিকৃত হয়ে রূপমাত্রের সৃষ্টি করে। বায়ু থেকে জ্যোতির উদ্ভব হয়, রূপ ঐ জ্যোতির গুণ। স্পর্শমাত্র বায়ু যখন রূপমাত্রকে আবৃত করে, তখন জ্যোতি বিকৃত হয়ে রসমাত্রের সৃষ্টি করে। তাতেই রসাত্মক জলের উদ্ভব। সেই রসাত্মক জল যখন রূপমাত্রকে আবৃত করে তখন জল বিকৃত হয়ে গন্ধমাত্রের সৃষ্টি করে। তাতেই পৃথিবীর জন্ম হয়।

মহাভারত অনুসারে এই বিশ্বসংসার প্রথমে ঘোরতর অন্ধকারে আবৃত ছিল। অনন্তর সমস্ত বস্তুর বীজভূত এক অণু প্রসূত হইল। ঐ অণুে অনাদি, অনন্ত, অচিন্তনীয়, অনির্বচনীয়, সত্যস্বরূপ নিরাকার, নির্বিকার, জ্যোতির্ময় ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত হইলেন। অনন্তর ঐ অণুে ভগবান প্রজাপতি ব্রহ্মা স্বয়ং জন্ম পরিগ্রহ করিলেন।

সৃষ্টিকর্তা হিসেবে ব্রহ্মা প্রথমে সত্ত্বগুণান্বিত দশ জন মানুষ বা প্রজাপতি সৃষ্টি করলেন। সনাতন ধর্মমতে এই প্রজাপতিরাই মানবজাতির আদিপিতা। মনুস্মৃতি গ্রন্থে এই প্রজাপতিদের নাম পাওয়া যায়। ঐরা হলেন মারীচি, অদ্রি, অঙ্গিরস, পুলস্ত, পুলহ, ক্রতুজ, বশিষ্ঠ, প্রচেতস বা দক্ষ, ভৃগু ও নারদ। কিন্তু এরা কেউ প্রজা সৃষ্টিতে অর্থাৎ বংশ বিস্তারে উৎসাহী হলেন না। তাই ব্রহ্মা মানুষ সৃষ্টির জন্য প্রজাপতি দক্ষকে আদেশ দিলেন। তিনি সৃষ্টি করলেন প্রথম মানব সয়ম্ভব মনু এবং মানবী পরমা প্রকৃতিরূপা শতরূপা। সনাতন ধর্মমতে মনু ও শতরূপার সন্তান-সন্ততিরাই বর্তমানের মানব জাতির পূর্বপুরুষ।

ধর্ম অর্থ কাম এই তিনটিকে ভারতীয় দর্শনে বলা হয় ত্রিবর্গ প্রতিপত্তি। সনাতন ধর্মমতে প্রজাপতি পদ্মযোনি ব্রহ্মা মর্ত্যে জীবনের সৃষ্টি করেন। ভগবান বিষ্ণুর নাতীপদ্মে তাঁর সৃষ্টি বলে তিনি পদ্মযোনি। সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মা প্রজাপতিদের সৃষ্টি করেন। সপ্তর্ষি নামে পরিচিত সাত মহান ঋষির স্রষ্টা ব্রহ্মা। ঐরা তাঁকে বিশ্বসৃষ্টির কাজে সহায়তা করেন।

ব্রহ্মা সিদ্ধিলাভ করার জন্য মানুষকে বলেছেন ধর্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গ সাধন করতে। ত্রিবর্গ সাধনে উপায় হিসাবে তিনি এক লক্ষ অধ্যায়ের উপদেশ মালা রচনা করেন।

সেখান থেকে ধর্ম বিষয়ক উপদেশ মালা পৃথক করে ধর্মশাস্ত্রপ্রণয়ন করেন সয়ম্ভব মনু মনু সয়ম্ভব, অযোনিসম্ভব। কারণ তিনি প্রজাপতি দক্ষের সৃষ্টি। বৃহস্পতি আর এক ভাগ নিয়ে আলোচনা করেন এবং রচনা করেন অর্থশাস্ত্র। মহাদেবের অনুচর নন্দী সেই উপদেশমালা হতে কামসূত্রগুলি পৃথক করে রচনা করেন কাম শাস্ত্র।

সনাতন ধর্মমতে এভাবেই সৃষ্টি হয় ব্রহ্মাভি এবং শুরু হয় মানব সভ্যতা বিকাশের।

-----○-----

মিনিগল্প: সুপ্ত শব্দ

- কমলেশ রায়

আকাশে ঘন কালো মেঘ। চারপাশে আঁধার নেমে এসেছে। সন্ধ্যা নামার আগেই রাত জেঁকে বসতে চাচ্ছে। বাড়ি এলো বলে। পাহাড়ি এই এলাকায় ঘরবাড়িও বেশ ফাঁকায় ফাঁকায়। রাতে হিম ঠাণ্ডা পড়ে। সন্ধ্যাসী মনে মনে প্রমোদ গুনলেন। নিরাপদ একটা আশ্রয় খোঁজা দরকার।

বাঁকটা পার হতেই চোখে পড়ল একটা বাড়ি। সন্ধ্যাসী দ্রুত পা চালালেন। বাড়িটা থেকে হালকা ঢালু হয়ে নেমে এসেছে রাস্তা। বাইরে থেকে বোঝা যায় না বাড়িটা এত সুন্দর। গোছানো, চমৎকার নকশার। তিনি দরজায় কড়া নাড়লেন। বাইরে ততক্ষণে ঝড়ো বাতাস বইতে শুরু করেছে। বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা শুষ্ক মাটিতে পড়ছে সশব্দে।

দরজা খুললেন এক নারী। দীর্ঘাসী। বয়স মধ্যভাগ পেরিয়েছে। ধারালো চেহারা। চোখ দুটো গভীর, কাজলপরা। আগতের পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার ভালো করে দেখে নিলেন নারী। তবে তিনি মুখে কোনো কথা বললেন না। চোখ নাচিয়ে মুখে এমন একটা ভাব ফুটিয়ে তুললেন যাতে স্পষ্ট বোঝা গেল প্রশ্নটা : কী চান ?

একটু আশ্রয়। এই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে কোথায় যাব মা। সন্ধ্যাসী বললেন বটে, তবে একটা সন্দেহও তার ভেতরে কাজ করল। ভদ্রমহিলা বাংলা বোঝেন তো ? দেখে তো অবাঙালিই মনে হচ্ছে।

কাম। দরজা থেকে সরে দাঁড়িয়ে দীর্ঘাসী নারী বললেন। সন্ধ্যাসী ভেতরে ঢুকলেন। তারপর কিছুটা আপন মনেই বললেন, ‘এই ভাব অনেক দিন আগেই মন থেকে

পর্ব প্রায় শেষের দিকে। অল্পপূর্ণা নারী প্রতিটি পদ খুবযত্ন করে তুলে দিয়েছেন পাতে। তিনি নিজেও নিরামিষ খান। তাই সন্ধ্যাসীর জন্য বাড়তি রান্নার প্রয়োজন হয়নি।

সন্ধ্যাসীর হাত ধোয়া শেষ হলে একটি পরিষ্কার তোয়ালে এগিয়ে দিলেন গৃহকর্তী। অতিথির হাত-মুখ মোছা শেষ হওয়ার পর তিনি খুব বিনীত ভাবে বললেন, একটা কথা বলার ছিল।

নির্দিধায় বলো মা। সন্ধ্যাসী আগ্রহে গলায় বললেন।

আমি খুব ভালো বাংলা জানি না, তবে ভালোই বুঝতে পারি। আপনিও নিশ্চয়ই ইংরেজি কিছুটা হলেও জানেন ও বোঝেন। ইংরেজিতে ‘কাম’ শব্দটার অর্থ আসুন বা এসো। আপনি তখন বলেছেন, কামভাব অনেক দিন আগেই আপনার মন থেকে চলে গেছে। হয়ত গেছে। কিন্তু মস্তিষ্কের ভেতরে রয়ে গেছে। আমার তো মনে হয় মস্তিষ্কের গভীরে কোথাও সুপ্ত অবস্থায় রয়ে গেছে শব্দটা। নইলে আপনার মুখ থেকে এমন কথা বের হতো না। আমি একজন নর্তকী। পুরুষদের খুব ভালো করেই চিনি। মুখে কিছু না বললেও শুধু চোখ-মুখ দেখে বলে দিতে পারি একজন পুরুষের মাথার মধ্যে কী ঘুরপাক খাচ্ছে। দৃঢ় আত্মবিশ্বাসী গলায় কথাগুলো বললেন আশ্রয়দাত্রী।

এরপর সন্ধ্যাসীর মাথা নিচু করে ফেলা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। বাইরে প্রবল ঝড়বৃষ্টি। না হলে তিনি এখান থেকে দৌড়ে পালাতেন। লজ্জায় আর চোখ তুলতে পারলেন না তিনি। গ্লানিতে ভরা অবসন্ন গলায় সন্ধ্যাসী বললেন, অসতর্ক এক মুহূর্তে মুখ থেকে শব্দটা বেরিয়ে গেছে মা। মাথার ভেতরের এই সুপ্ত শব্দটা বের করে দেওয়ার বাকি সাধনাটুকু আমি অবশ্যই করব। তুমি নিশ্চিত থাকো মা।

শিবু, সাধুবাবার শোবার ঘর তৈরি হলো ? নারীটি গলা চড়িয়ে জিগ্যেস করলেন।

হ্যাঁ মা, তৈরি। বয়োবৃদ্ধ গৃহকর্মী শিবু লণ্ঠন হাতে কাশতে কাশতে এগিয়ে এলো।

যান, বিশ্রাম নিন। সন্ধ্যাসীকে আন্তরিক গলায় বললেন ঝাজু এক নারী।

(কমলেশ রায় : লেখক, সাংবাদিক। সাবেক ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, দৈনিক সকালের খবর।)



ATLAS BUSINESS SOLUTIONS

Certified Practising Accountant
SMSF Auditor



ABS is a CPA
Practice

Morshed Hasan CPA
CEO

Tel : 08 9470 3560

Fax: 08 9472 0506

Email: info@atlasbusiness.com.au

www.atlasbusiness.com.au

461 Albany Highway
Victoria Park WA 6100
PO Box 26,
Parkwood WA 6147



An authorised representative of Capstone Financial Planning,
no: 1242658. AFSL no: 223135

Services we provide:

- Tax return preparation for companies
- Trust, Partnership, SMSF, individual
- Accounting services for business
- BAS/GST return quarterly
- Auditing of self managed superfund
- Bookkeeping/payroll services
- Business tax planning
- Financial accounting and reporting
- Taxation & superannuation strategies
- Formation of new business
- Formation of SMSF
- Business name registration
- Changes of business ownership
- ABN/TFN application processing
- Investment property consultation
- Negative gearing advice

শুক্লুর নিজেকে বিশ্বাস বংশের একজন ধারক প্রমাণ করার জন্য, সাবিহার দিনরাতব্যাপী ক্যাচ ক্যাচ বন্ধ করার জন্য এবং বড়লোক হওয়ার জন্য রাজি হয়ে যায়। একটু খোঁজ করতেই জেনে ফেলে পাথর কারা কেনে। তারপর আর কি ? পাঁচ দিন আগে জবেদ মেম্বারের লোকজন পাথরটা নিয়ে গেছে। আর শুক্লুরের হাতে এসেছে টাকা। এত টাকা ওরা কখনো দেখেনি। সেই থেকে সাবিহা পুরোপুরি স্বপ্নের ভেতর ডুব মেরেছে। কি কি কিনবে তার লিস্টি শোনাচ্ছে দুই বেলা। কিন্তু শুক্লুর মনে হচ্ছে না টাকাগুলো খরচ করতে পারবে। কী সুন্দর গন্ধ টাকার গায়ে ! সাবিহার গায়ের গন্ধ এর কাছে কিছু না। শুক্লুর সুযোগ পেলেই সেই গন্ধে মাতোয়ারা হচ্ছে আর ভাবছে, টাকা খরচ না করে বরং বাড়াতে হবে। সাবিহা যতই বলুক, শুক্লুর একটা টাকাও খরচ করতে পারবে না। খরচ হলেই তো গেল। টাকা হাতে থাকা মানে রক্ত গরম থাকা। আর রক্ত গরম না থাকলে পুরুষ মানুষের তেজ মরে যায়।

পাথর চুরির ঘটনা থানায় জানানো হয়েছে। দারোগা সাহেব এসেছেন বার দুয়েক। দু'বারই শুক্লুর অসুখের ভান করে বিছানায় শুয়ে ছিল। বড় বিশ্বাস অবশ্য তাকে নিয়ে কোন কিছুই ভাবেননি। ওর ম্যান্দামারা ইমেজটা ওকে সাহায্য করছে। কিন্তু মর্জিনার কাছ থেকে তথ্য পেয়ে বউ যখন শুক্লুরের বড়লোক হয়ে যাওয়া সম্বন্ধে জানাল, তখন বড় ধাক্কা খেলেন তিনি। শুক্লুরকে ডেকে পাঠালেন। মুড়ি আর চা খেতে খেতে বললেন, তুই বলে ম্যালা টাকা পাইছির ? সে তো ভাল কথা। আমার রক্তের কেউ বড় হলি আমার চেয়ে বেশি খুশি আর খিড়া হবে ? কিন্তু, মনে বড় দাগা পালাম রে শুক্লুর। ইরাম বড় কতাডা তুই আমারে জানালিনে ?

শুক্লুর জিভ কাটে। আল্লা-রসুলের নাম ধরে বলে, সব মিথ্যে কথা। বড় বিশ্বাস আশ্বস্ত হন। অতঃপর ওর চাকরি কেমন চলছে, ধানের বাজার পড়ে এসেছে ইত্যাদি বিষয়ে মিনিট তিনেক কথা বলে উঠে পড়েন। শুক্লুরও দম ফেলার সুযোগ পায়। তারপর গরম রক্তের তেজ দেখাতে ঘরে গিয়ে সাবিহার চুলের মুঠি ধরে জীবনে প্রথমবারের মতো। মাগীর কথা শুইনে পরকালে নরকবাস আর ইহকালে হাজতবাস কত্তি হবে মনে অচ্ছে। সাবিহা কাঁদে আর বিলাপ করেও কিছু দেয়-থোয় না আবার গায় হাত দ্যায় ? ভাত দেওয়ার মুরদ নেই, কিল মারার গোঁসাই ! থু !

শুক্লুর আলীর কানে ঢোকে না কিছুই। সাবিহাকে মারার পরই প্রথম টের পায়, ওর হাতের আঙ্গুলগুলো কিরকম ঠান্ডা হয়ে আসছে। হাত মুঠি করতে কষ্ট, মুঠি করে ফেললে আর খুলতে পারে না। সেদিন রাতেই প্রথম বিছানা ছাড়ে। স্পষ্ট আহবান টের পেয়েছিল বুকের গভীরে। সারা পৃথিবীতে কোথাও শান্তি নেই, অসহ্য সবকিছু। সব শান্তি ঐ দেড় ফুট বাই দেড় ফুট জায়গাটায়। শুক্লুর শান্তির শীতলতায় শরীর-মন জুড়িয়ে নেওয়ার জন্য ঐখানে রাত কাটিয়েছিল। আজ চার রাত ধরে ঐটাই ওর বিছানা।

দিনের বেলায়ও শুক্লুর মাজারের কাছে যাওয়া এড়াতে পারে না। চুপচাপ বসে থাকে আর পা থেকে মাথা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়া আরামে বিম ধরে যায়। কয়েকজন পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কি প্রশ্ন করেছে, ও জানে না। জবাব দেওয়ার মতো অবস্থা ওর ছিল না। সাবিহা এসে গা-এ হাত দিতেই ধড়মড় করে জেগে উঠেছিল। ওর মনে হল সাবিহা বুঝি হাতের মুঠোয় জ্বলন্ত আগুন নিয়ে ওর শরীরে চেপে ধরেছে।

বড় বিশ্বাস নরম গলায় প্রশ্ন করলেন, তোর কী অয়ছে রে শুক্লুর ?

শুক্লুর তার হঠাৎ হঠাৎ শক্ত হয়ে যাওয়া হাতের আঙ্গুল থেকে কবজি, পায়ের আঙ্গুল থেকে হাঁটু নিয়ে বেকায়দা পড়ে যাচ্ছে। অনেক সময় দাঁড়াতেও কষ্ট হয়। ভয়ে-আতঙ্কে গলা শুকিয়ে যায় তখন। কিন্তু পানি খেতে গেলেই মনে হয় গরম আগুন গলা দিয়ে নেমে যাচ্ছে।

নিজের এইসব সমস্যাগুলো নেমে যাচ্ছে। নিজের এইসব সমস্যাগুলো বড় বিশ্বাসকে খুলে বলবে ভাবল। কিন্তু পাথরডা ...এইটুকু বলার পর ওর হেঁচকি তুলে কান্না পরিস্থিতির উপর মোলায়েম প্রলেপ দিয়ে দিল। বড় বিশ্বাস দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, পাথরডা আমাদের বংশের এট্টা দামি জিনিষ ছিল। এট্টা সিরিতি। তোর মতো আমারও খুব খারাপ লাগতেছে। তুই কান্দিস্ নে। আল্লা আল্লা কর, যদি ফেরত পাওয়া যায়।

পাথরের শোকে বিহবল শুক্লুর, বড় বিশ্বাস বউকে তেমনটিই বললেন। বউ পান মুখে দিয়ে বলে,বউডা ওর জীবনডা ধ্বংস কইরে দেল। ছেমড়ির লোভ দেখলি অয়ে যায় ! ইরাম সুজা স্বামীডারে কিরাম যে কষ্ট দেয় ! আসলে ছোটলোকের বংশ তো....

মাঝ রাত্তে শুক্লুর দরগাখোলা থেকে ডাক পেয়েও নড়তে পারে না। ওর শরীরটা পাথরের মতো পড়ে থাকে আর ও টি টি করে ডাকে সাবিহাকে। সাবিহা গয়নার দোকান থেকে তাড়াতাড়ি চলে আসার কষ্টটা চেপে শোনে স্বামীর সমস্যার কথা। বোকা লোকটা পাগল হয়ে যাচ্ছে নাকি ? প্রচন্ড গরমে ঘেমে নেয়ে একাকার সাবিহার মনটা নরম হয়ে যায়। স্বামীকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে টের পায়, সত্যিই শুক্লুরের শরীরটা শক্ত হয়ে আছে। কী চমৎকার ঠান্ডা শরীর ! শুক্লুর সাবিহার ঘুমের ভেতরে তলিয়ে যাওয়া দেখে আর গালাগালি করে। ওর কষ্ট কোনদিনই বুঝবে না হারামজাদি।

ওদিকে দরগাখোলা থেকে ভেসে আসছে আয় আয় ডাক। দেড় ফুট বাই দেড় ফুট জায়গাটা মায়ের কোল হয়ে অপেক্ষা করছে ওর জন্য। শুক্লুর বহু কষ্টে শক্তি সঞ্চয় করে নিজের ভেতর। সাবিহাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে নিজেকে টেনে টেনে নিয়ে আসে। বাঁপিয়ে পড়ে মায়ের বুকে মুখ ঘষতে গিয়ে নাক ছুলে যায়। তা-ও কী শান্তি ! গভীর ঘুমে তলিয়ে যাওয়ার আগে অস্পষ্টভাবে টের পায় মাজারের ঢাকনিটা খুলে গেছে। আলোর প্রদীপ হাতে তিনি বেরিয়ে এসেছেন। ওজু করবেন। শুক্লুর নিজের বুকের উপর তাঁর পাক কদমের ছোঁয়া পেয়ে বলে ওঠে, শুক্লুর আল হামদুলিল্লাহ্ ! যদিও রাতজাগা পাখিগুলোর ডাকাডাকিতে ওর কথা শোনা গেল না।



অহঙ্কারের উত্থান

- ডঃ অসিত সাহা

সাধারণ ভাবে অহঙ্কার বলতে আমরা বুঝি – যা কিছু সব আমাদের নিয়ে, আমাদেরকে নিয়ে। যেমন আমার বুদ্ধি, আমার জীবন, আমার অর্থ, আমার সম্পদ, আমাররূপ, আমার গুণ ইত্যাদি সৃষ্টিকর্তা জীবনের শুরুতেই সবার ভেতর অহঙ্কারের বীজবপন করে রেখেছেন। এটা কেমন জানেন, সুন্দর ঘাঁসের লনে যেমন উইডের প্রাদুর্ভাব – যদি কন্ট্রোল না করেন তাহলে খুব শীঘ্রই সমগ্র লনে ছড়িয়ে যায়। দেখতেও খুব বিচ্ছিরি লাগে। অহঙ্কারও ঠিক সেই রকম – যদি কন্ট্রোল করতে না পারি, তাহলে খুব দ্রুত সেটা ছড়িয়ে পরে।

অহঙ্কারের নানা রকম প্রকার ভেদ আছে, যেমন তামসিক অহঙ্কার, রাজসিক অহঙ্কার, আবার সাত্ত্বিক অহঙ্কার । শুনছি তামসিক অহঙ্কারীকে কালো, রাজসিক অহঙ্কারীকে কমলা এবং সাত্ত্বিক অহঙ্কারীকে হলুদ রঙ এর দ্বারা চিহ্নিত করা হয় বা তুলনা করা হয়। সে যাই হোক, আমার এই রচনা অহঙ্কারের উৎসকে নিয়ে অহঙ্কারের শ্রেণীভেদ নিয়ে নয়।কোন অহঙ্কারের বীজ – কোন উইড কিলার এ মরবে সেটা না হয় পরে আলোচনা করা যাবে।

মিথ্যাবাদীর কূটাভাষ – ভারী মজার শব্দ, ভারী মজার যুক্তি ওবটে।

ধরুন আমি আপনাকে একটা অংকের সমীকরণ দিলাম $X = -\frac{1}{X}$

যদি মনে করি আমার $X = +১$ (কোনো ধনাত্মক মান), আমার সমীকরণ বলেনা তোমার $X = -১$ (ঋণাত্মক মান) । আবার যদি বলি আমার $X = -১$ (ঋণাত্মক মান) , তাহলে আমার সমীকরণ বলেনা তোমার $X = +১$ (ধনাত্মক মান)। ভারী মজারতো যদিকেই যাই – সেই দিকেই আমাকে বোকা বানিয়ে দেয় । কেন এমন হয় বলুনতো?

ধরুন আপনার মনের সুন্দর সবুজ লনে মিথ্যাবাদীর কূটাভাষ এর মতন কোনো অহঙ্কাররূপী উইড সবীজ লুকিয়ে আছে।আপনি কিভাবে তাকে কিল করবেন, যদিক থেকে তাকে মারতে আসবেন, সে তো উল্টো দিক থেকে বেরিয়ে আসবে । এরতো একটা উপায় বের করতে হবে!

আমি একটা উপায় বলতে পারি, যেমন ধরুন আপনি একটা কাল্পনিক নম্বর তৈরী করলেন, $i = \sqrt{-1}$, তাহলে কিহলো, $i^2 = -1$

এই সমীকরণের দূদিকেই যদি, i দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমরা পাবো $= -\frac{1}{i}$, এবার আমরা পুরোনো সমীকরণটাতে ফিরে যাই, $X = -\frac{1}{X}$

এখন দেখিতো ডান দিকে $X = i$ বসালে বাম দিকে কিপাই ! বাম দিকে আমরা $X = i$ পাই ।

তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়ালো আমাদের এমন একটা উপায় বের করতে হবে (এখানে $X=i$), যেটা মনের সেই অহঙ্কার রূপী উইড সবীজকে মারতে পারে। আমি এখন সেই ”আই ” প্রসঙ্গে আসছি।

বিশ্বের এই উদ্ভাস (manifestation) আমাদের মধ্যে এক উপলব্ধি আনে যা থেকে আমাদের মনে হয় যেন – আমি আর আমার জগৎ দুটো ভিন্ন সত্তা। এটাতো সত্যি যে বিশ্বের উদ্ভাস যদি না থাকতো, তাহলেতো আত্মা কখনো বুঝতে পারতো না যে সে একটি পৃথক সত্তা । মস্তিষ্ক এবং মন হলো একটা দ্বৈত কোয়ান্টাম সিস্টেমও

পরিমাপক যন্ত্র । অহঙ্কারের উৎস সেই সঙ্গমে যেখানে মস্তিষ্ক এবং মন একই সঙ্গে জগৎ সংসারের কালরূপ সাগরে ডুব দেয়। Manifestation of absolute truth is a virtual frame of appearance in which we experience a dual feelings where one can separate themselves within the frame. Brain-Mind as a system immerse into the manifested frame of absolute truth. From there an Ego evolves in the virtual space.

অহঙ্কারের বীজ হয়তো তখনই উচ্ছেদ করা সম্ভব যখন মস্তিষ্ক এবং মন একই সঙ্গে জগৎ সংসারের কালরূপ সাগরের বদলে অসীম অনন্ত পরম সত্য সাগরে ডুব দেয় ।

-----○-----

কোথা থেকে এলো কোলকাতা

- আজিজইসলাম

এক শালিকের তিন মাথা

শালিক যায় কোলকাতা

কে ভেবেছিল এই বাল্য বুদ্ধির চাতুর্য পরীক্ষার ধাঁধায় এত বড় ঐতিহাসিক সত্য লুকিয়ে থাকতে পারে? ঐতিহাসিক সত্য হল তিন মাথার শালিকের আগমনের আগে থেকেই শহরের কোলকাতা নাম প্রচলিত ছিল। এতদসত্ত্বেও২০০৩ সালে কোলকাতা উচ্চ আদালতকে রায় জারী করে এই নাম প্রতিষ্ঠা করতে হয় ।

পাঠশালায় পড়েছি, যব চার্নক তিনটি গ্রাম: কালিকট, সুতানুটি ও গোবিন্দপুরের পত্তনি নিয়ে কলিকাতা শহর প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু কালিকট হতে কলিকাতা নামের উদ্ভব হয়নি। এই শেষ মন্তব্যটি ঔৎসুক্যের কাঁটা হয়ে মনের কোনে গঁেথে গেল, তাহলে কলিকাতা নামের উৎপত্তি হল কোথা থেকে? সুতানুটি ছিল চরকায় সুতা কাটা ও সুতা রপ্তানির কেন্দ্র, দেবদেবীর নামে গ্রামের নাম অতি সাধারণ, কিন্তু কলিকাতা?

সূবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবার ১৬০৮ সালে কলিকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর এই তিনটি গ্রামের জমিদারি লাভ করেন। এই চৌধুরী পরিবার পরিষদ ও নয়জন স্বতন্ত্র ব্যক্তি পাঠশালায় পড়ে আসা সেই জানাকে চ্যালেঞ্জ করে কোলকাতা উচ্চ আদালতেএকটি গণ আরজি দাখিল করেন। তারা চ্যালেঞ্জ করেন যে, ১৬৯০ সালে যব চার্নক কতৃক কলিকাতা শহরের পত্তন হয় নাই।

বিজ্ঞ আদালত বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ নিমাই সদন বোসের সভাপতিত্বে ৫-সদস্যের একটি বিশেষজ্ঞ কমিটির হাতে তদন্তের ভার অর্পণ করে। কমিটির অন্যান্য সদস্য ছিলেন: ডঃ বরুণ দে, ডঃ সুশীল চৌধুরী, ডঃ অরুণ দাশ গুপ্ত ও ডঃ প্রদীপ সিংহ।

তদন্ত কমিটির রিপোর্টে বেরিয়ে বেরিয়ে এলো নতুন তথ্য। যব চার্নক সুতানুটি গ্রামে আগমন করেন ১৬৯০ সালে এবং ১৬৯৩ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

আর এই তিনটি গ্রামের প্রজাস্বত্ব অধিকার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে দান করা হয় ১০ নভেম্বর ১৬৯৮ তারিখে। শহর প্রতিষ্ঠা দূরের কথা, গ্রামগুলির পত্তন নেয়ার সময়ই তাঁর হয় নি। উপরন্তু, মনসাবিজয় কাব্যে (মনসামঙ্গল কাব্যসাহিত্যের রচনাকাল পঞ্চদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী) ও আইন-ই-আকবরিতে ১৫৯৬ সালের দলিলে ”কলিকাতা” নামের উল্লেখ আছে। কমিটির প্রাপ্ত ফলাফল প্রধান বিচারপতি অশোক কুমার মাথুর ও বিচারপতি জয়ন্ত বিশ্বাস সমন্বয়ে গঠিত কোলকাতা উচ্চ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ অনুমোদন করে।

ত্রিশ বছর পর অষ্ট্রেলিয়া এসে কোন সূত্রে পড়লাম: ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি হুগলী নদীর পূর্ব তীরে কালীঘাটা বন্দরের কাছে প্রথম ঘাঁটি নির্মাণ করে। হঠাৎ করে মনের কোনে গাঁথা কাঁটায় টান পড়ল; তাহলে কালীঘাটা হতে কি ”কলিকাতা” নামের উদ্ভব? কোলকাতার এক পার্শ্ববাসী বয়োজ্যেষ্ঠ শিক্ষাবিদেের কাছে আমার পাঠশালায় পঠিত অভিজ্ঞতাসহ বিষয়টি উত্থাপন করলে এক কাকতালীয় মিল ঘটে গেল। তিনিও তাঁর পাঠশালায় আমার পঠিত একই বিবরণ পাঠ করেছেন। বললেন, কালীঘাটা হতে ”কলিকাতা” নামের আগমন সম্ভব, কিন্তু তিনি এমন কোন সূত্র পান নি। বলা বাহুল্য, কালীঘাটা বন্দর বিখ্যাত কালীমন্দির ছাড়াও তুলিশিল্লের জন্য বিখ্যাত ছিল যা বিদেশী বণিকদের জনপ্রিয়তায় কালীঘাট পেইন্টিং নামে আরো খ্যাতি অর্জন করে।

বাংলাপিডিয়া প্রকাশিত হলে (২০০৩) উদঘাটিত হল আরেক রহস্য। পত্তনি নেয়া তিন গ্রামের মধ্যে কালিকট নেই, আছে কলিকাতা। সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটানিকার শরণাপন্ন হলাম শুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য। কী আশ্চর্য! সেখানেও কলিকাতা। এ কী সেক্সপিয়ারীয় মহানটকীয়তা ! এতদিন তাহলে কি পড়েছি? মাচ এডো এবাউট নাথিং?

”ক্যালকাটা” নামের উৎপত্তির নানা গল্প চালু আছে। যেমন, ইংরেজ সাহেব জিজ্ঞেস করলো: এ জায়গার নাম কি? কৃষক ভাবলো সাহেব বুঝি মাড়াইয়ের জন্য গাদা করে রাখা কাটা ধানের কথা জিজ্ঞেস করছে, বললো: কাল কাটা হয়েছে। সাহেব ধরে নিল এ স্থানের নাম ক্যালকাটা। এ গল্পের ভিন্ন ভাষ্য পাওয়া যায় এবং এটা ”কলিকাতা” নামের নয়, ”ক্যালকাটা” নামের উৎপত্তির হাস্যরসাত্মক গল্প।

”কোলকাতা ব্লগ” নামের এক ওয়েবসাইটে এই কাহিনী দেখে অবাক হই। বাল্যকালে পিতার কাছে এ গল্প শুনে আমার বাল্য বুদ্ধিতেও এটাকে তামাশার গল্প বলে গণ্য করতে দ্বিধা হয়নি, কারণ এরূপ আরো গল্প ছিল যার উদ্দেশ্য হাস্যরস যেমন, সাহেব এক দল লোক দেখে জিজ্ঞেস করলো: এ জায়গার নাম কি? এরা ছিল গায়কের দল, ভাবলো তাদের রঙ্গিন পোশাক দেখে সাহেব উৎসুক হয়েছে, তাদের নেতা বললো: মাই মেন সিং। স্থানের নাম হয়ে গেল মৈমনসিং।

নোবেল-প্রাপ্ত সাহিত্যিক বিদ্যা সুন্দর নাইপলের জীবনীকার ইংরেজ সাংবাদিক-ঐতিহাসিক প্যাট্রিক ফ্রেঞ্চ ১৯৯৬ সালে সবরমতি আশ্রম থেকে পুনর সৈকতে গিয়ে গান্ধীর লবণ সত্যাগ্রহের পুনরানুষ্ঠান করেন, যদিও তিনি যান বাসে ও ট্রেনে, পায়ে হেঁটে নয়। তিনি সর্বত্র ইংরেজদের ভারতীয় শব্দের উচ্চারণে বিকৃতি লক্ষ্য করে এটাকে তাঁর স্বজাতির জন্মগত অক্ষমতা (congenital inability) বলে খিঁকার দিয়েছেন। বাঙ্গালির হাস্যরস সৃষ্টির শৈল্পিক সৃজনশীলতা যেমন প্রশংসনীয়, তেমনি তারা বিদেশীদের বিকৃতিকে সহজে মেনেও নেয়। কবি গোপীপদ চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায়

<p> </p>	
<p>”দাস্য সুখে হাস্যমুখ বিনীত যোড়কর প্রভুর পদে সোহাগ মদে দোদুল কলেবর”</p>	

ব-দ্বীপ ও প্লাবনভূমিতে নদী সচরাচর গতিপথ পরিবর্তন করে।



কালীঘাটা বন্দরের কালীমন্দির ও ঘাট

”একূল ভাঙ্গে ওকূল গড়ে এইতো নদীর খেলা।” বৃটিশ ঘাঁটি নির্মাণের সময়ই হুগলী নদী (ভাগীরথী) কালীঘাটা থেকে সরে এসেছে। কালীমন্দির এখনও পুরাতন হুগলীর (আদি গঙ্গা) তীরে বিদ্যমান এবং পুরাতন নদীপথ বর্তমান হুগলীর সঙ্গে এখনও সংযুক্ত। নদীর গতিপথের মত চলতি ভাষা ব্যবহারের রীতিরও পরিবর্তন হয়। যেমন, কালীঘাটা >কালীকাটা >কালিকাতা >কলিকাতা, এভাবে নামের পরিবর্তন হওয়া সম্ভব, কিন্তু এটা নেহাৎ আমার কল্পনা। ”কলিকাতা” নামের উৎপত্তি নিয়ে শিরোপীড়া নিরসনের জন্য ওয়াইকিপিডিয়া পাঁচটি সম্ভাবনা লিপিবদ্ধ করেছে: কালীক্ষেত্র; কালীঘাট; কিলকিলা (অর্থ সমভূমি); খাল কাটা; এবং কলি (চুন) ও কাতা (উৎপাদনের স্থান)। তাহলে কোথা থেকে এলো কোলকাতা! কেউ আগ্রহী হলে এটা একটি গবেষণার বিষয় হতে পারে।

মর্জিনা বিশ্বাস বাড়ির বউদের বদনাম করতে সিদ্ধহস্ত বলেই সাবিহার সাথে সখি সখি সম্পর্ক হতে সময় লাগেনি। সুখ-দুঃখের কথা শোনার মতো আর কে আছে সাবিহার ? আর কার সাথে এমন মন খুলে কথা বলতে পারে ? আর কে আছে ? সাবিহা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, স্বামী থেকেও নেই রে বুনডি। আমার পুড়া কপাল।

মর্জিনাও একই তালে নিঃশ্বাস ফেলে বলে, আমি যদি তুমার সুয়ামি হতাম, তালি সব কাজ ফেইলে এই মুখটার পানে চাইয়ে থাকতাম। তুমার জন্যি পান্ডাম না এমন কোন কাজ নেই। শুধু আমি ক্যান, তুমার জন্যি দেওয়ানা হতি সবাই পারে।

পারে না শুধু ঐ খাটাসটা। ভাত-কাপড়ের বাহার নেই, আমি বইলে ওর ঘর করি।

সাবিহা তার পর পুজ্ঞানুপুজ্ঞভাবে মর্জিনাকে বুঝিয়ে বলবে, তার স্বামীকে কিভাবে ভেড়া বানিয়ে রেখেছে ঐ বাড়ির বউরা। তাবিজ-কবচ করে লোকটাকে অন্ধ বানিয়ে ফেলেছে। আর তাই সে তার রূপ-যৌবনের নেশায় পাগল হয় না। সে কি পারত না ব্যবসা-বানিজ্য বা যা হোক একটা কিছু করে বউ-এর সব শখ মেটাতে ? ওরা চায় না তাদের স্বামীর চাইতে বড় হোক তার স্বামী। আসল ব্যাপার আর কিছু না, তার রূপ দেখে ঈর্ষায় জ্বলে ওরা।

আজ ওসব কথা হয় না। বরং মর্জিনার কাঁধে হাত রেখে এরপর সাবিহা গোপন কোন তথ্য দিচ্ছে এমন ভঙ্গিতে বলে, এইবার ওগের থোতা মুখ ভোঁতা হয়ে যাবেনে দেইখে নিস্।

কিরাম কইরে ? কওনা....উ হু !

আমিও দামি দামি শাড়ি-গয়না পইরে পায় মল বাজায়ে ঝামঝাম কইরে পত চলব। লোকে দ্যাখপে আর সালাম দেবে। আমি শুদ্ধ কইরে কব, ক্যামন আছেন আপনারা ? আমাদের বাড়ি আসবেন কিন্তু।

সে ম্যালা ভাল হবেনে ভাবীসাব। কিন্তুক কিরাম কইরে ? আমাগের ভাই কি গুণ্ডখন পাইছে ?

ব্যাপারটা অনেকটা সেরকমই। এট্টা ব্যবসায় টাকা খাটাইল আমার বুদ্ধিতি। ভাগ্যিস বুদ্ধিডা শুনিল। ম্যালা লাভ হইছে জানিস্ ? আসল তো আসল, সুদির সুদ গুইনে কুল পাচ্ছিনে রে বুন।

মর্জিনার চোখ কপালে উঠে গেছে আর বৃকের মাঝে কেন কে জানে ঈর্ষার মতো তীক্ষ্ণ কাঁটা বিঁধে যাচ্ছে। হঠাৎ বড়সড় কোন ঘটনা ঘটে গেছে তার অজান্তে। এখন ঘটনার আদ্যপান্ত না জানলে চলবে না। মর্জিনা তাই সাবিহার হাত শক্ত করে ধরে বলে, তুমার পায় পড়ি ভাবীসাব। খুইলে কও। তুমার আল্লার দুহাই।

মর্জিনার চোখ কপালে উঠে গেছে আর বৃকের মাঝে কেন কে জানে ঈর্ষার মতো তীক্ষ্ণ কাঁটা বিঁধে যাচ্ছে। হঠাৎ বড়সড় কোন ঘটনা ঘটে গেছে তার অজান্তে। এখন ঘটনার আদ্যপান্ত না জানলে চলবে না। মর্জিনা তাই সাবিহার হাত শক্ত করে ধরে বলে, তুমার পায় পড়ি ভাবীসাব। খুইলে কও। তুমার আল্লার দুহাই।

এসব কিছু কানে ঢোকেনি সাবিহার। ও দিব্যি দেখছে দামি শাড়ি-গয়না পরে উঠান পেরিয়ে যাচ্ছে সাবিহা আর যে যেখানে আছে,

সবার মুখ হা হয়ে যাচ্ছে ওর চোখ ধাঁধানো রূপ দেখে। ভেজা কাপড় পরে শুক্কুর আলী ঘরে ঢুকলে অতৃপ্ত মর্জিনা চলে যায়। সাবিহার চোখে এসব কিছুই পড়ে না। শুক্কুর আলী অফিসের কাপড় পরে খেতে আসে। আগে সাবিহার এরকম ভাবকে পাশ কাটিয়ে অফিসে গিয়ে পালাতে চাইত। কিন্তু দিন কয়েক হল শুক্কুরের মেজাজও শান দেওয়া ছুরির মতো হয়ে গেছে। রাগে গরগর করতে করতে বলল, ভাত রান্ধ নাই ?

সাবিহা এখন শহরে রিক্সায় করে ঘুরছে।

শালার মাগী মানষির দানাই নেই। আগে আমার পাছার কাপড় মাথায় তুইলে ফেলত টাকা নেই টাকা নেই কইয়ে। এখন কোল ভইরে টাকা দিলাম, তাও খাতির-যত নেই আমার। যে পাপ করিছি, তা কার জন্যি করিছি ? ছোটলোকের বিটির কথা গুইনে নিজির হাতে গু খাইছি।

সাবিহা সিনেমা হলে ঢুকেছে।

শুক্কুর আলী দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনে মনে বিলাপ করতে লাগল। জোরে বললে, কে কোথায় শুনে ফেলবে। কেউ না শুনলেও মর্জিনা ঠিকই দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে দিল বিশ্বাস বাড়ির বড় বউ-এর হাত-পা টিপতে টিপতে। ম্যালা টাকা পেয়েছে শুক্কুর আলী।

ব্যবসা-ট্যাবসার কথা বললেও সেটা বিশ্বাস করতে বাঁধছে। মর্জিনা উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে। বলে, দরগাখোলার পাথরডাও চুরি হল আর তেনারও হাতে টাকা আসল !

দরগাখোলার গাঁ ঘেষে ছিল দেড় ফুট বাই দেড় ফুট বাই চার ইঞ্চি আয়তনের কাল কুচকুচে একটি কষ্টি পাথর। বিশ্বাস বংশের সেই কামেল মানুষটি এর উপরে দাঁড়িয়ে ওজু করত। তাঁর পবিত্র শরীর বেয়ে পানি ঝরত এর উপর। আর তাই ঠান্ডা, খুব ঠান্ডা ছিল পাথরটি। গরমের দিনে আরামের আশায় মানুষ শ্রদ্ধাভরে পাথরটি ছুঁয়ে দিত। হাতের ভেতর দিয়ে বৃকের ভেতরে আরামচুকে যেতে তারা চোখ বুঁজে আরামের ভঙ্গি করত। বিবাগী মানুষটা শেষ বয়সে বাড়ি ফিরেছিলেন। ততদিনে তাঁর স্ত্রী গত হয়েছে। ছেলে ছোটখাট আলেম হয়েছে, সংসার পেতেছে। তিনি সব দেখে সুখি হলেন। সারা রাত সবাইকে পাশে বসিয়ে নসিহত করে ওজু করলেন। নামাজ পড়ে ঘুমাতে গেলেন। সেই ঘুম আর ভাঙেনি। পুকুরের পাশে কবর দিয়ে পাথরটাকে পাশেই রাখা হয়। কয়েক শ, বছর এভাবেই ছিল।

চুরিটা শুক্কুর আলীর হাত দিয়েই হয়েছে। অফিসে নানান রকমের মানুষ আসে, নানান আলাপ হয়। এভাবেই একদিন জেনেছিল, পুরনো পাথর বিক্রি হয়। প্রচুর টাকা পাওয়া যায়। শুক্কুর কিন্তু প্রথমে বিশ্বাসই করতে চায়নি। বরং হেসেছে। তবে বাড়ি ফিরে সাবিহাকে বলার সময় হাসার সুযোগ পায়নি। সাবিহা স্পষ্ট ভাষায় প্রস্তাব করে, তুমাগের বাড়ির ঐ পাথরডা বিক্রি করলি মনে অয় ম্যালা দাম পাওয়া যাবেনে। শুক্কুর ভয় পেয়েছিল এরকম ভয়ানক কথা শুনে। সাবিহা ওর গা ঘঁষে বসে হাতটা চেপে ধরে। তারপর একের পর যুক্তি সাজিয়ে যায়। পাথর শুধু শুধু পড়ে থাকলে লাভ কি ? পাপ হবে ? কেন ? সেই কামেল পুরুষ বরং খুশিই হবেন জড় পদার্থটার ওসিলায় তিনি যদি তার উত্তরপুরুষের ভাগ্য ফিরিয়ে দিতে পারেন। শুক্কুর আলী কি তাঁর বংশের কেউ নয় ?

দুই নম্বর মানতি ডা কি ?

যদি ছাওয়াল হয়, তবে তার নামের সাথে বিশ্বাস লাগাবা। তার থেইকে শুরু হবে আমার নতুন বংশ, বিশ্বাসের বংশ। বিশ্বাস...আল্লা-তাআলার উপর বিশ্বাস। রাক্বুল আলামীন, তুমি রহম করো। কুনভাবেই য্যান তাগো সে বিশ্বাসে ফাটল না ধরে। কিয়ামতের দিন আমি য্যান আমার বংশধরগের জন্য দাবি রাখতি পারি তোমার কাছে। তুমি রহম করো মালিক। বউ, হাত তোল তেনার দরবারে। বল আমীন।

আমীন।

শুক্কুর আলীও গলা মেলায়, আমীন। সুম্মা আমীন।

দূরের মসজিদ থেকে আজান ভেসে আসছে। ঘুমের চেয়ে নামাজ উত্তম, হে বিশ্বাসীগণ, আল্লাহ্ মহান। শুক্কুর ছটফট করে জেগে ওঠে নামাজ পড়ার জন্য। মাজারের পাশে সেই পুরণো পুকুর, আলোর প্রদীপ মাটিতে নামিয়ে রেখে যে পুকুরের পানিতে ওজু করছিলেন সেই কামেল পুরুষ, সেই পুকুরের পানি দিয়ে সে ওজু করতে ব্যস্ত হয়। এক সময় নাকি এই পুকুরে সোনা-রূপার থালা-বাসন ভেসে উঠত। মানুষ তার দরকারের সময় কামেল পুরুষের দোহাই দিয়ে চাইলেই পরদিন সকালে পাওয়া যেত সেসব। দরকার মিটলেই পানিতে ভাসিয়ে দিতে হত। কবে কোন্ এক অবিশ্বাসী সোনার লোভ সামলাতে না পেরে একটা বাটি লুকিয়ে রেখেছিল। তারপর আর ভাসেনি সোনার বাসন। মানুষের লোভ নিশ্চয় আহত করেছিল মাজারে ঘুমিয়ে থাকা জাগ্রত আত্মাটাকে।

ওজু শেষ করে উপরে উঠতে গিয়ে টের পায়, ও নড়তে পারছে না। পা আটকে গেছে মাটির ভেতর। কী সর্বনাশ, এখন ও কী করে ? মাজারের ঢাকনাটা কি খুলে গেল ? মনে হচ্ছে, আলোর প্রদীপ হাতে সেই তিনি উঠে দাঁড়িয়েছেন। এখন কী হবে ? শুক্কুর গোঙাতে গোঙাতে কাপড় ভিজিয়ে দেয়। ওজুটা নষ্ট হওয়া মাত্র পা নড়ানোর শক্তি ফিরে পায়। ঘুমের চেয়ে যত উত্তমই হোক নামাজ, সেটা পড়তে গিয়ে বিপদে পড়ে যাওয়ায় এখন ওজু ভেঙ্গে গিয়ে উদ্ধার পাওয়াটাই বেশি উত্তম বলে মনে হতে থাকে ওর। অভ্যেস বশতঃ শুকুর আল হামদুলিল্লাহ্ বলতে গিয়ে জিভ কাটে। তওবার নাম করে আল্লাকে সান্তুনা দেয়, দুপ্পুর বেলায় জোহরের সাথে এই বেলার কাজাডা পইড়ে নিবানে। যদিও গত কয়েকদিন ধরে ওজু সেরে একই ভাবে কাপড় নষ্ট করে দিচ্ছে বলে কোন বেলার কাজা তো দূরের কথা, আসলটাও পড়া হচ্ছে না। এই জোহরে পারবে নিশ্চয়, এই আশা করে শুক্কুর আলী পুকুরে নেমে লম্বা করে একটা ডুব দেয়। তারপর বাড়ির পথ ধরে। অফিসে যাওয়ার সময় হয়ে গেল প্রায়।

নয়টা থেকে পাঁচটা জীবন বীমার শাখা অফিসের পিওন শুক্কুর। চাকরিটা দিয়ে ওকে ধন্য করেছেন বড় বিশ্বাস, অর্থাৎ তফাজ্জল আলী বিশ্বাস। শুক্কুরের বাপ আর বড় বিশ্বাসের বাপ ছিলেন আপন চাচাত ভাই। শুক্কুর আর ওর তিন বোন

বাপ-মা হারিয়েছে কৈশোর পেরোনোর আগেই। বড় বিশ্বাস আত্মীয়তাকে অগ্রাহ্য করতে পারতেন, কিন্তু করেননি। বোনদের মোটামুটি ভাল বিয়ে দিয়েছেন আর শুক্কুরকে দিয়েছেন এই চাকরি। সাবিহার ভাষায়, যে না একখান চাহারি ! শুক্কুর জানে, এর চেয়ে ভাল কিছু ও আশা করতে পারে না। পূর্বপুরুষের বিবাগী স্বভাব পেয়েছিল ওর বাপটা। আর বড় বিশ্বাসের বাপ সেই আমলে দারোগাগিরি করেছেন, ছেলেগুলোকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন, টাকা-পয়সা জমিয়ে জমি-জিরাত বাড়িয়েছেন। শুক্কুর ছোট বেলায় বড় আক্বাকে শুধু আক্বা ডাকার জন্য ছটফট করত। ওর অতিশয় মুখচোরা স্বভাবের জন্য তিনি ওকে বেশ ভালও বাসতেন। শুক্কুরের মনে আছে, এক ঈদে তিনি ওকে লেবেধুঙ্গ খাওয়ার পয়সা দিয়েছিলেন।

শুক্কুর বিয়ের আগে খুব সুখে ছিল। চাচাত ভাইদের অনেক আছে, ওর কেন নেই, এই ভাবনা কখনো ওকে পেয়ে বসেনি। বিশ্বাস বাড়ির যে কোন ব্যাপারে ওর আগ্রহের কমতি ছিল না। তাই স্কুল ফেরত বালিকা সাবিহার রূপ দেখে তাকে বিয়ে করার জন্য পাগল হয়ে ও নিশ্চয় চিন্তে জোর গলায় বলেছিল, আমরা বিশ্বাস বংশের। জমি-জিরাত এত যে তুমি ভাইবে কুলোয় উঠতি পারবা না আর আমাগেত্তা খাইয়েই তো সাত গিরামের মানুষ বাঁইচে রয়ছে। সে কী আজকের কতা ? বহু কাল ধইরে আমরা বি-রা-ট, বুঝিছাও ? সাবিহার সাথে নির্বিঘে বিয়ে হয়ে গেল বলা যায় কথার জোরেই। বিয়ের অর্ধেক খরচ ভাইরা দিল, বাকিটার জন্য জমি বেচেছিল ও। হাজার হলেও বিশ্বাস বংশের ছেলের বিয়ে, গিরামের সওলি খাতি না পাল্লি কী অয় ? গ্রামের লোকজন খুশি হয়েছিল। আর তাই শুক্কুর তৃপ্তির ঢেকুর তুলে বাসর রাতে সাবিহার পাশে বসে রসের আলাপ শুরু করার উদ্যোগ নেয়। কিন্তু চান্সটা ওকে দেয় না সাবিহা। নতুন বউ প্রথম যে কথাটি ওকে বলেছিল, তা হচ্ছে গয়নাগুলান আসল মনে অচ্ছে না। কয় ভরির কও দিন ?

সেই থেকে শুক্কুর আলীর সাবিহার সাথে আলাপের ইচ্ছেটা আর তৈরি হয়নি। তা নিয়ে সাবিহার আক্ষেপ নেই। বরং সে মুখ খুললেই নাকি তার গা জ্বলে। শুক্কুরের যে কোন কথা সাবিহার কাছে সমালোচনাযোগ্য এবং অবশ্যই পরিত্যাজ্য। তরকারিতে লবন দিতে বললে সাবিহা অবশ্যই লবন দেবে না এবং চা-এ চিনি চাইলে গুনে গুনে তিন চামচ লবন দেবে। বাচ্চা-কাচ্চা চাইলে বলেছে, বিশ্বাস বাড়ির ছেলে-মেয়েরা যেভাবে বড় হয়, শুক্কুর সেভাবে যদি পারে তো বাচ্চা হবে, নইলে থাক। সাবিহা বাচ্চা না হওয়া অটুট শরীর নিয়ে শুক্কুরের রক্তে আগুন ধরিয়ে দেয়। অথচ সাবিহাকে ছুঁয়ে দেখার আগ্রহ বোধ করে না খুব একটা। মনে মনে কলা খায়, মনে মনেই খোঁসা ছুলতে ওর ভাল লাগে।

সাবিহা তখনো চুলায় রান্না চড়ায়নি। এলোমেলো চুল, ঘুম থেকে উঠে মুখও ধোয়নি। স্বামী রাতে কোথায় ছিল, এ নিয়েয় চিন্তায় অস্থির হয়ে আছে, তা কিন্তু নয়। দাওয়ায় পা ছড়িয়ে বসে তাকিয়ে আছে সামনে।ঠোঁটের কোনায় সুখের হাসি আর তাই দেখে ঐ বাড়ির বড় বউ-এর বাঁদী মর্জিনা টিপ্পনি কাটে ভাইজানরে দ্যাখলাম পুকুরি কোমর পানিতি দাঁড়ায়ে রয়ছে। ভাবী সাহেবার গোছল অবৈ নে কোন্ কালে? দেইখ, পাক না হয়ে চুলোয় আগুন দিও না। তালি কলাম সুয়ামির অমঙ্গল হবে নে।

২৬

স্বপ্ন প্রতিমা

- শর্মিষ্ঠা সাহা

বিকাশ পাল, প্রতিমা শিল্পী। দুই ভাই এক বোনের মধ্যে মেঝ। বড় ভাই প্রকাশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে সরকারী কলেজেরে ইংরেজি শিক্ষক। বর্তমানে ঢাকায় কর্মরত। বর্তমান যুগে বাপ-দাদার পথ ধরে শুধুমাত্র প্রতিমা আর মাটির কাজ করলে সম্মান থাকে না, পেটও ভরে না। বাড়ির বড় ছেলে হিসাবে প্রকাশ সব সময়ই চেয়েছে সমাজের চোখে সম্মানজনক কোন কোন পেশা বেছে নিতে। তার সাফল্যে আত্মীয় – স্বজন সকলেই গর্বিত। কেবল বাবা সুশীল পালের মনে খুঁতখুতি, বংশের জাত ব্যবসা থেকে তার সন্তানেরা সড়ে যাচ্ছে বলে।

বিকাশের ছোট বোন মালা বিজ্ঞান বিভাগ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিচ্ছে। ওর ইচ্ছা ডাক্তার হবে। যদি চান্স না পায় তবে অন্তত ফার্মাসিতে অনার্স করবে। তিন ভাই বোনের মধ্যে বিকাশই একমাত্র ব্যতিক্রম। সে সব সময় সুন্দর সুন্দর প্রতিমা বানানোর স্বপ্ন দেখেছে। যখন ওর বয়স ছয় কি সাত তখন থেকেই বাবার সংগে চলে যেত সরকার বাড়ী দুর্গা প্রতিমা বানাতে। প্রতি বছর ওদের প্রতিমা তৈরীর কাজটি শুশীল পালের জন্য বাঁধা। দিনের পর দিন প্রতিমার কাঠামো বানানো থেকে শুরু করে রঙ তুলিতে রূপদান পর্যন্ত প্রতিটি ধাপ বাবার সংগে থেকে লক্ষ্য করত বিকাশ। প্রতিমা শিল্পে ছোট ছেলের এই আগ্রহ দেখে সুশীলের বুকটা ভরে উঠত। কিন্তু বিকাশের মা সুলেখা খুব খুশি হতে পারেনি। তার ইচ্ছে ছেলে লেখাপড়া শিখে ভদ্র সমাজে চলার উপযুক্ত হয়ে উঠুক। ছেলেকে নিয়ে বাবা মায়ের ভিন্নমুখি প্রত্যাশা এবং নিজের প্রাণের টান সব মিলিয়ে বিকাশ ভর্তি হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলায়। এতদিন যে কাজটি সহজাত ভাবেই করেছে সে কাজের পিছনের তত্ত্বগুলো জানতে পেরে বিকাশ বেশ উচ্ছ্বসিত। তবে প্রতি বছর দুর্গা পূজার আগে বাড়ীতে গিয়ে বাবার কাজে সাহায্য করতে তার কখনও ভুল হয় না। এখন সে শুধু বাবার কাজের মুগ্ধ দর্শক নয়, সহকারীও বটে। আধুনিক চিত্র শিল্পের নানা বিষয়ে বাবা ছেলের কাছে জানতে চান। ছেলেও তার নতুন অর্জিত বিদ্যা বাবার সংগে শেয়ার করতে পেরে মহা খুশি। প্রতিমা শিল্পেও যে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে সে বিষয়টিই তাদের আলোচনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রতিমা আর এখন শুধু খড়ের গাঁথুণীর উপর মাটির প্রলেপ দিয়ে তৈরি হয় না, পূজা শেষে সিজর্ন দেবার জন্য। প্রবাসিরা একবার প্রতিমা নিয়ে বার বার পূজা করে। মাটির প্রতিমা এর জন্য উপযুক্ত নয়। এজন্য ভিন্নভাবে প্রতিমা তৈরি করতে হয় । অথচ উপর থেকে দেখলে সেই মা দুর্গা ও তাঁর সন্তানেরা । বিশ্ববিদ্যালয়ে বিকাশের সিনিয়র দাদা প্রভাত মাঝে মাঝেই কলকাতা যায় প্রতিমা শিল্পীদের সংগে দেখা করতে। তার ইচ্ছে বাংলাদেশেও এ ধরনের কাজ শুরু করে। এ কাজে বংশ পরম্পরায় চলে আসা শিল্প চর্চার পাশাপাশি আর্থিক লাভের দিকটিও বজায় থাকে। প্রতিমা তৈরিতে বিকাশের আগ্রহ দেখে প্রভাত ওর সংগে এ বিষয়ে আলোচনা করে। দুজনে স্বপ্ন দেখে ভবিষ্যৎ প্রতিমা তৈরি করে বিদেশে পাঠানোর ব্যবসা শুরু করার।

এবার নববর্ষের দিন মঙ্গল শোভাযাত্রায় একটা বড়সড় মুখোশ বহন করতে বিকাশ ও তার বন্ধু শিবলি হিশিম খাচ্ছিল। হঠাৎ শিবলিকে সরিয়ে দিয়ে প্রভাত এসে ওটার এক কোনো ধরে ফেলে। বিকাশ ও শিবলি প্রথমে থমকে গেলেও পরে সামলে নেয়। প্রভাতদা এমনই। তবে ওরা জানত প্রভাত কলকাতা গেছে, এরই মধ্যে ফিরে এসেছে

সেটা জানত না। তাই অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে,

- কি ব্যাপার, তুমি না কলকাতায় গেলে?
- হ্যাঁ গেছিলাম, আবার চলেও এসেছি। একটা দারুন খবর আছে।
- খবর, কিসের?
- শোন্, কলকাতার এক প্রতিমা শিল্পি অনেক গুলো প্রতিমা বানানোর অর্ডার পেয়েছে। আমাকে বলেছে সবগুলোর গহণা, মুকুট তৈরি করে দিতে। বেশ কিছু টাকা পাওয়া যাবে।
- কিন্তু সময় কতদিন?
- দুই থেকে আড়াই মাস। জুনের শেষে ওদের ডেলিভারি দিতে হবে।
- বলকি, এত কম সময়ে কি করে হবে? পড়ালেখা, টিউশনি সব সামলে তুমি পারবে?
- আরে আমি একা করবো কে বলেছে! তুইও আমার সাথে থাকবি।
- কিন্তু মা কি রাজি হবে? আমার পড়ালেখার ক্ষতি হবে যে।
- জীবনে এমন সুযোগ দুইবার আসে না। মাসি মেসোকে রাজি করানোর দায়িত্ব আমার।

ফোনের ওপাশে নিরবতা । বাবা কিছু বলছে না বুঝে বিকাশ পড়ে যায় টেনশনে।

- হ্যালো বাবা, কিছু বলছো না কেন? কি হয়েছে?
- কি আর বলবো.... মালা খুব অসুস্থ..., হাসপাতালে।
- কি বলছ, কি হয়েছে ওর?
- এখানকার ডাক্তার বলেছে ঢাকায় নিয়ে যেতে। ডাক্তারই ফোন করে পিজি হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করেছে। আমরা এখন ঢাকায় রওনা হচ্ছি। বাকীটা পরে বলবো।

বাবা ফোন রেখে দেয়। কি বলার জন্য বাবাকে ফোন করতে চেয়েছিল, আর কি শুনল বিকাশ। প্রভাত এবং শিবলি দুজনেই নির্বাক। প্রথম ধাক্কা সামলে নেবার পর তিনজনে উঠে পড়ল পরবর্তি পদক্ষেপের ভাবনা নিয়ে। বাবাকে পরে আবার ফোন দিয়ে বিকাশ জানতে পারে মালার অসুখ মায়ুর। হঠাৎ পিঠে প্রচন্ড ব্যথা, তারপর বমি। এরপর ধীরে ধীরে নিচের দিক থেকে অবশ হয়ে যাচ্ছে। ডাক্তার রেফার করেছে নিউরো মেডিসিন বিভাগে। অবস্থা বুঝে নিউরো সার্জারিতে ভর্তি করা লাগতে পারে।

সেই রাতে বিকাশ, প্রভাত আর শিবলি অনেকের সাথে যোগাযোগ করে সবচেয়ে ভাল ডাক্তারের অধীনে যাতে মালার চিকিৎসা হয় সেটা নিশ্চিত করে। এরপর শুরু হয় যমে মানুষে টানাটানি। প্রচুর টাকার যোগন দিতে হলো। শুরুতে বিকাশের দাদা ও বাবা অর্থের যোগন দিলেও তাঁদের সঞ্চয়

শেষ হতে সময় লাগে না। এদিকে অবস্থার এমন নাটকীয় পরিবর্তনে বিকাশ যেন হঠাৎ করেই স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে। সে বাবা মাকে জিজ্ঞাসা না করেই প্রভাতের কাজটি নিয়ে নিয়েছে। সারাদিন ক্লাস, হাসপাতাল দৌড়াদৌড়ি করে আর রাতে প্রতিমার কাজ। দুই মাস পর মালার অবস্থা কিছুটা উন্নতি হয়। বিকাশের প্রতিমার কাজও প্রায় শেষ। প্রভাত এগুলো নিয়ে কলকাতায় গেলে বেশ কিছু টাকা পাওয়া যাবে। বাবাকে টাকা পাওয়ার কথা জানালে প্রথমে তিনি কিছুটা অবাক হলেন। তবে এই দুর্দিনে কিছু টাকা পাওয়া যাচ্ছে ভেবে বেশি কথা বাড়ালেন না।

টানা চার মাস হাসপাতালে চিকিৎসার পর মালাকে যখন ছাড়া হল তখন সে হারিয়ে ফেলেছে এক চোখের দৃষ্টি। বাম পায়ের জোড় পুরোপুরি ফিরে পায়নি। ডাক্তার এর চেয়ে বেশি করতে পারেনি। ওষুধ চলবে আরও বেশ কিছুদিন । প্রতিমাসে একবার করে হাসপাতালে আসতে হবে। মালার মত প্রাণবন্ত মেয়ের এই পরিনতি দেখে মা বাবা ভাইদের মন ভেঙ্গে গেছে। সকলেই আড়ালে চোখের জল ফেলে যাচ্ছে অবিরত। মালাকে বাড়ীতে নিয়ে যাবার সময় বিকাশও গেছে তার সাথে। তার একটুও ইচ্ছে করছে না ঢাকায় ফিরে যেতে। মা বলেছেন কয়েকবার ফিরে যেতে কিন্তু বিকাশের মুখের দিকে চেয়ে বলা বন্ধ করেছেন।

দুর্গা পূজার প্রতিমা বানানো শুরু করতে হবে। সরকার বাড়ী থেকে বার বার সুশীলকে ফোন করছে। কিন্তু মেয়ের এই অবস্থায় ভিতর থেকে সাড়া পাচ্ছেন না তিনি। বিকাশ বাবাকে জানায় এবারে প্রতিমা সে বানাতে চায়। ওর লেখাপড়ার ক্ষতি হবে বলে বাড়ীর সকলে প্রথমে আপত্তি জানায় । কিন্তু বিকাশ সবাইকে আশ্বস্ত করে যে, এটা তার পড়াশুনার এসাইনমেন্ট হিসাবে দেখাতে পারবে। প্রভাত স্যারের সাথে কথা বলে সব কিছু পাকাপাকি করেছে।এর জন্য পড়াশুনা খুব একটা পিছাবে না।এরপর মত না দিয়ে কিই বা করবেন মা বাবা । বাড়ীর সবাই উপলব্ধি করতে পারছে যে, মালাকে ছেড়ে বিকাশ এখন ঢাকায় যাবে না। তাছাড়া মালার চিকিৎসার জন্য ধার dena হয়েছে প্রচুর । এ অবস্থায় দুর্গা প্রতিমার কাজটা ছেড়ে দিলে একদিকে যেমন সরকার বাড়ীর সংগে সম্পর্কটা সংকটাপন্ন হয় অন্যদিকে আর্থিক ক্ষতিও কম যায় না। অগত্যা সরকার মশাইয়ের সংগে কথা বলে বিকাশকেই পাঠান হয় দুর্গা প্রতিমা বানাতে।

ছেলে বেলা থেকে বাবার সংগে বহুবার সরকার বাড়ীতে এসেছে বিকাশ । মাটির দলা থেকে মায়ের রূপ ধারণ নিজের চোখের সামনেই ঘটেছে প্রতিবছর। কিন্তু এবছর বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন - শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব কিছুই নির্ভর করছে তার নিজের উপর। মা দুর্গা দেখতে কেমন হবেন, কোন দিকে তাকিয়ে কতটুকু হাসি দিবেন সবকিছু। প্রতিমা তৈরির জিনিসপত্র যোগাড় করতে কেটে গলে বেশ কয়েকদিন। কাঠামো তৈরি শুরু করতে গিয়ে প্রথম সে অনুভব করে বাবা কেন প্রতিমা গড়তে চাইনি এবছর । মনটা ভারী হয়ে গেল সাথে সাথে — শত চেষ্টা করেও কাজ এগনো গেল না পরবর্তী কয়েকদিন।

একটু পর পর ফোন করে মালার সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করে, কাজ হবে কি করে। প্রায় এক সপ্তাহ সময় লাগল কাজে মন বসাতে। আর একবার যখন মন বসে গেল, কাজ এগালো দ্রুত গতিতে। তৈরি হয়ে গেল লক্ষ্মী, স্বরস্বতী, কার্তিক গণেশ, পৈঁচা,

রাজহাঁস, ময়ুর আর হুঁদুর ।। মা দুর্গার রঙের কাজও প্রায় শেষ। কিন্তু মায়ের মুখের কাজ শেষে বিকাশ নিজেই চমকে গেল — এটা সে কি করেছে, মালার মুখের অবয়ব বসিয়ে দিয়েছে দুর্গার মুখে! বর্তমানের মলিন ভাবলেশহীন মালা নয়, আগের সেই প্রাণবন্ত মালা । বুঝতে পারে নিজের অজান্তেই সে বসিয়ে দিয়েছে মালার সেই মুখ। যে মুখটি ঠাঁই নিয়েছে অবচেতন মনের গভীরে। অবচেতনের প্রভাব পড়েছে চেতনের কাজে।

প্রথম বিহ্বলতা কেটে যাবার পর নতুন আশংকা ভর করে বিকাশের মনে - সরকার মশায় কিভাবে নেবেন বিষয়টিকে। গতানুগতিক মায়ের মুখের বদলে তিনি কি মেনে নিতে পারবেন মালার এই মুখকে। সে রাত্রে বিকাশের কিছুতেই ঘুম এল না। রঙ তুলি নিয়ে শুরু হল এর উপরে মায়ের পরাবাস্তব মুখকে ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস। সারারাত কাজের পর ফিরে পেল সেই পরাবাস্তব মুখ। এখন আর কেউ বুঝতে পারবে না এই মুখের আড়ালে লুকিয়ে আছে প্রিয় মালার মুখটি। শুধু বিকাশই জানবে নিজের মনে, এ তার স্বপ্ন প্রতিমা।

দিনের আলো ফোটার এখন আর অল্প কিছুক্ষণ বাকি। বিকাশ মন্দিরে পাশে তার শোবার খাটে গিয়ে শুয়ে পড়ল একটু ঘুমিয়ে নেয়ার জন্য। একবারে না ঘুমালে যে দিনে কাজ করা যাবে না । ঠাকুর বানানের সময় এ ঘরটি বরাদ্দ থাকে পাল মশায়ের জন্য । বিকাশের চোখের পাতা যখন সবে বুজে এসেছে তখন হঠাৎ কানে ভেসে আসে ভাঙা চোড়ার শব্দ।অনেকে একসঙ্গে কিছু ভাঙছে।নিখুম রাত শেষের গভীর ঘুমও বেশিক্ষণ টিকল না। বিকাশ লাফ দিয়ে উঠে বসে বিছানায়। একটু ধাতস্ত হলে বুঝতে পারে শব্দ আসছে মন্দিরের দিকে থেকে। দৌড়ে মন্দিরের কাছে যেতে যেতে দেখে আলো আধারিতে কয়েকজন লোক দৌড়ে বের হয়ে যাচ্ছে মন্দির থেকে। সামনে মাটিতে পরে আছে দুর্গা মায়ের মুখমন্ডল। মুখটি বুকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠে বিকাশ। শব্দ হৈচৈ শুনে বাড়ীর ভিতর থেকে বেরিয়ে সরকার বাড়ীর মানুষ। শোকে বিহ্বল বিকাশ তখন মায়ের ভাঙা মুখমন্ডল বুকে জড়িয়ে নির্বাক পাথর। দুচোখ বেয়ে শুধু অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে অব্যোার ধারায়।



পাথর সময়

- নাসরীন মুস্তাফা

ঘুমের ভেতর নড়ে চড়ে ওঠে শুক্কুর আলী। বিড়বিড় করে বলে, আসতিছি। সাবিহা পাশে শুয়ে থেকেও কিছুই টের পায় না। শুক্কুর নিজেও টের পায় না কি এক ঘোরে সে বিছানায় উঠে বসে, তারপর নেমে যায়, তারপর দরজার ছিটকিনি খুলে ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত্রের রহস্যময়তাকে বিন্দুমাত্র পাতা না দিয়ে নেমে যায় উঠানে এবং আগের চাইতে আরেকটু বেশি স্পষ্ট করে বলে, আমি আসতিছি। ওর চোখ আলোহীন কালো রাতের পর্দা ফুড়ে দরগাখোলার কালো পাথরটাকে খুঁজে নিতে চায়। পারে না বলে ছটফট করে ওঠে। ছোটবেলায় মা-এর কোল যেভাবে আকর্ষণ করত, সেই একই আকর্ষণে একছুটে এসে থামে দরগাখোলার পা-এর কাছে। যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে মায়ের কোলে। বলে, আমি আসিছি।

দরগাখোলার গা ঘেঁষে বসে পড়ে মাটির গা থেকে মা-এর শরীরের ঘ্রাণ নিতে নিতে নিজের শরীরটাকে দুমড়ে-মুচড়ে ছোট্ট করে ফেলতে চায়। মায়ের গর্ভে পুনরায় ঢুকে পড়ার মতো করে মাটির ভেতরে সঁধিয়ে দিতে চায় নিজেকে। হয় না। হাত-পা-এর আঙ্গুলের খোঁচায় মাটিতে রকমারি নকশা তৈরি হতে থাকে শুধু। মাত্র দেড় ফুট বাই দেড় ফুট জায়গাটার মধ্যে ওর দশাসই আকৃতিটা সত্যিই এঁটে গেছে। শুক্কুর আলী সন্তুষ্ট হয়ে চোখ বুঁজে বলে, শুকুর আল হামদুলিল্লাহ্ !

কালো কুচকুচে রাত, সাবিহার চুলের মতো। সাবিহা ভেজা চুল পিঠে এলিয়ে শরীরের বাঁক তুলে রোদ পোহায় পুকুর পাড়ে। এখান থেকে বিশ্বাস বাড়ির বড়লোক বউদের দেখা যায়। প্রায়ই বউগুলো গয়না-শাড়ি পরে সাবিহার মনের ভেতরটায় আঙুন জ্বালিয়ে রোদ কিংবা বাতাস খায়। সাবিহাও ছেড়ে দেওয়ার পাত্রী নয়। নিজের রূপ রোদের আলোতে ঝকঝক করে ও বাড়ির পুরুষগুলোর মাথা খাক্ আর বউগুলোর জ্বলে যাক্ পিভি । সাবিহা এইরকম ইচ্ছের খেলায় মেতে ওঠে প্রতিদিন। আর রাতে সদরের এক বীমা অফিসের পিওন, ভুল করে স্বামী বনে যাওয়া শুক্কুর আলীর নির্লিপ্ত ভ্যাদামারা মুখের উপর অদৃশ্য থুতু ফেলে নিজের পোড়া কপালের বৃত্তান্ত বর্ণনা করে। ভাত খেয়ে শুক্কুর তৃপ্তিতে বলে ওঠে শুকুর আল হামদুলিল্লাহ্ আর সাবিহা সাথে সাথে শুক্কুর ফকিরাল্লাহ্ বলে নিষ্ঠুরতম কণ্ঠে। লোকটা ছাই খেয়েও বলবে শুকুর আল হামদুলিল্লাহ্ !

সাবিহার কপাল পুড়ে খাক্ হয়ে গেছে বলেই না এমন ভাতার জুটেছে। নইলে শুক্কুরও তো বিশ্বাস বংশেরই ছেলে। কিন্তু তার মতো হাভাতে অবস্থা আর কারো নেই। লোকে বলে, দরগাখোলার কামেল পুরুষের আশির্বাদ আছে বলেই বহু পুরুষ ধরে বিশ্বাস বংশের কেউ কখনো বিফলকাম হয় না। যা করতে যায়, তাতেই সফল হয়।

সাবিহা কাঁদে আর শুক্কুর আলীর জন্ম-ঘটনায় কোন কলংক আছে কি না আবিষ্কার করতে চায়। মা মরে বেঁচেছে। নইলে সাবিহা কাঁদে আর শুক্কুর আলীর জন্ম-ঘটনায় কোন কলংক

আছে কি না আবিষ্কার করতে চায়। মা মরে বেঁচেছে।

নইলেসাবিহা যে মেয়ে, শ্বাশুড়ি বলে ছেড়ে দিত না, সত্যিই জিজ্ঞেস করত, কোন্ ফহিরির ব্যাটার সাথে জিনা কইরে ইরাম ছাওয়াল প্যাটে ধরিলে গো আবাগির বিটি ? শুক্কুর আলী বিশ্বাস বংশের কেউ না, সাবিহা এমনটাই বিশ্বাস করে দৃঢ়ভাবে।

শুক্কুর মাথাটাকে মাজারের ক্ষয়ে যাওয়া দেয়ালে ভর দিতে গিয়ে ভ্রমে পড়ে যায়। দুমড়ে মুচড়ে শরীর তো নয়, পুরো জীবনটাকে শিশুকালের আকৃতিতে ভরে ফেলে। কী আশ্চর্য ! মা-এর নরম বুকটায় মাথা দিয়েছে নাকি বহুকাল পর ? শুক্কুর আলী ঠোঁট চাটে, দুধের গন্ধ পেয়ে তৃষ্ণয় বুকটা খা খা করে ওঠে ওর। মনে মনে তৃষ্ণকে অনুসরণ করতে গিয়ে মা-এর বুক, দুধের বোঁটা, তারপর তার গর্ভ, গর্ভের অন্ধকার, তারও পর সাঁতারে ব্যস্ত বাপের শুক্রাণু....বহু পথ-ঘাট পার হতে হতে শুক্কুর আলী বিশ্বাস ইবনে কাদেম আলী বিশ্বাস ইবনে খয়বর বিশ্বাস....শুক্রাণুগুলো সময়ের শ্রোত বেয়ে ছুটতে ছুটতে যেখানে গিয়ে থামে, সেখানে আলোর প্রদীপ হাতে বসে থাকা এক মহাপুরুষকে দেখে শুক্কুর বোঝে, ও পৌঁছে গেছে। ঘুটঘুটে আঁধার রাতে প্রদীপটা নামিয়ে রেখে কুচকুচে কালো পাথরটার উপর দাঁড়িয়ে ওজু করছেন তিনি। এই মাত্র বিশ্বাস বংশের গোড়াপত্তন করে এসেছেন মানুষটা। স্ত্রী হাঁফাতে হাঁফাতে পুরো ব্যাপারটার ধাক্কা সামলে অবিন্যস্ত কাপড় টেনে টুনে উঠে দাঁড়াতে ব্যস্ত। রাত থাকতে থাকতে পুকুরে ডুব দিয়ে ফজরের নামাজটা সেরে ফেলবেন। স্বামী ওজু শেষ করে আজান দিতে দাঁড়িয়ে গেছেন। কী সুরেলা কণ্ঠ ! ঘুমন্ত মানুষগুলোকে মিষ্টি সুরে ডাকছেন, ঘুমের চেয়ে নামাজ উত্তম, ঘুমের চেয়ে নামাজ উত্তম, আল্লাহ্ আকবর - আল্লাহ্ মহান।

নামাজ শেষে দুজন আবার বসেন মুখোমুখি। স্বামী বলছেন, স্ত্রী শুনছেন। আদেশ নয়, উপদেশ নয়, অন্য কোন কিছু। যে আসেনি পৃথিবীতে, যাকে নিয়ে আসার জন্য দুজনের এই আয়োজন, তাকে নিয়ে নয় শুধু, তার সাথে তার পরবর্তী আরো হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ জনকে নিয়ে স্বামী-স্ত্রী আলোচনা করছেন। শুক্কুর আলী স্পষ্ট শুনতে পেল :

বউ, আমি তারে নিয়ে আল্লার কাছে দুডো জিনিষ মানিছ। কি মানিছ শুনবা?

আপনি কন। আমি শুনতিছি।

পরথমডা হল এই যে, আমি বিবাগি হব। সন্তান তোমার প্যাটে আসা মাত্রই আমি সংসার ছাড়ব। তুমি তারে মানুষ করবা। ছাওয়াল হলি আলেম বানাবা, আর মাইয়ে হলি আলেম দেইহে বিয়ে দিবা। পারবা না ?

এ কী কচ্ছেন ? আপনি...আপনি....(কান্না) আমি পতে পতে ঘোরব আর মানুষ জনরে আল্লার পতে আসতি কব। এই জীবন আমি তারে সঁপে দিছি, বিনিময়ে চাইছি এটা বংশ। এতবড় মানতের ফল না ফলে যাবেলানে। তুমি দ্যাখপা, এইবার তুমি মা হবা।

আনমনা হয়ে গিয়েছিল। মোবাইলে ররিংটোন শুনে দেখল দীপার কল। কল রিসিভ করতেই বলল, "এই কোথায় তুই?", রুদ্র গेटের দিকে তাকিয়ে দেখল দীপা একগুচ্ছ সাদা গোলাপ ফুল হাতে গेटে দাঁড়িয়ে আছে। সুন্দর করে সেজেছে আজও। একটি নীল রঙের শাড়ি পরেছে। অপরূপ লাগছে ওকে দেখতে।

রুদ্র দীপাকে গेटের বিপরীত ফুটপাথের দিকে তাকাতে বলে হাত ইশারা করলো। ওদের চোখাচোখি হলো। দীপা বলল, "ওখানেই দাঁড়া, আমি আসছি।", রুদ্র দীপাকে সাবধানে রাস্তা পার হতে বলে ফোন রেখে দিল এবং দীপার আসার দিকে তাকিয়ে থাকলো।


দীপা রাস্তা প্রায়ই পার হয়ে এসেছে। রুদ্রের দিকে তাকিয়ে একটু মৃদু হাসি দিল। ঠিক এমন সময় দীপার পিছন দিক থেকে একটি দ্রুতগতির বাস অন্য একটি বাসকে ওভারটেকিং করতে গিয়ে দীপাকে ধাক্কা দিল। দীপা ছিটকে পড়ে গেল। রুদ্র ঘটনার আকস্মিকতায় হতবিহবল হয়ে গেল। সে ছুটে গেল দীপার ছিটকে পড়া দেহের কাছে। রক্তে লাল হয়ে গেছে জায়গাটি। রুদ্র দীপার মাথাটি দুই হাতে উঁচু করে ধরে বসল। দীপা করুণ দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে আছে রুদ্রের দিকে। দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল ওর। কাঁপা কাঁপা হাতে রুদ্রের কপাল স্পর্শ করে আধো আধো স্বরে দীপা বলে উঠল, "শুভ জন্মদিন রুদ্র।", -শুনে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল রুদ্র।

আজ এক যুগেরও বেশি সময় পর রুদ্র তার কলেজ যাচ্ছে পুনর্মিলনীতে। বাসের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দীপার কথা ভাবতে ভাবতে দুই চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ল রুদ্রের।

-----o-----

LOTUS INDIAN GROCERIES

3/113 HIGH ROAD WILLETTON (NEXT TO AUTO MASTERS)



THE BIGGEST CHOICE

Sweets available from Mela

Wish all BANGLA community happy DURGA PUJA N PROSPERITY.
We Deal in all INDIAN products and if we don't have we will get for you.

One-to-one Music Lesson

offered by highly experienced musician and vocalist on Indian Classical Music Ragas, Ghazal, Bhajans, Modern Hindi and Bengali Songs, Folk songs, Devotional Songs with and without harmonium.

Please contact: **Mrs.MinuSaha**, MA (Philosophy), Post Baccalaureate (EC), Post Graduate Dip (EC)
Mobile: 0469 736 451, Ph: 6258 5309





One-to-one ATAR level Mathematics Methods and Mathematics Specialist, Chemistry, Physics and Biology Tuitions for High School students in Western Australia Curriculum, Australian National Curriculum and International Baccalaureate curriculum offered by highly experienced academic professionals

For details please contact: **Dr. A. K. Saha**, PhD (Mathematics), PhD (Intelligent Systems Engineering) Director, The Lambda Academy of Science, Perth, Western Australia
Mob: 0470 359 081
Ph: 6258 5309



এসো মা দুর্গা
- অমরনাথ চক্রবর্তি

মায়ের রাতুল চরণে পুষ্পাঞ্জলি নিতে মা আসছেন আমাদের মাঝে। তাইতো আমাদের মাঝে মা কে বরণ করার এই আয়োজন। প্রতি বছরই মা আসেন আমাদের মাঝে এই সময়ে সেই সাড়া জাগিয়ে। তাঁর আগমনে দিকে দিকে পরে যায় নানা সাড়া। প্রকৃতি যেন নতুন পরিবেশে সুন্দর হয়ে ওঠে, বারে পড়তে থাকে সকালের ফোটা শিউলি ফুল গুলি - মায়ের চরণে সহান নেবে বলে। কাশ ফুলের সাদা রঙের সমারোহে যেন মাঠ ঘাট আলো হয়ে ওঠে। পাখীরা গাছে গাছে নানা গান গায়।

পাঠা বরা গাছ গুলি মায়ের পরশে যেন নতুন জীবন পেয়ে জীবন্ত হয়ে সবুজ রঙে ভরে যায়। ঠিক এমনি একটা সময়ে কবি সাহিত্যিকরাও যেন মাতোয়ারা হয়ে হাতে তুলে নেন তাদের কাগজ -কলম। খুলে যায় তাদের সাহিত্যের বুলি। মা শুধু প্রকৃতির সৌন্দর্যের দিতে আসেন না। তিনি আসেন তাঁর সর্বশক্তি নিয়ে দুষ্টের দমন এবং অন্যায় ও অবিচারের সাথে লড়াই করে, জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে। মা আসেন প্রতি বছরই এই সময়ে আমাদের এই সব শিক্ষা দিতে ও মঙ্গল প্রদীপ জ্বালাতে।

আমাদের সবাই উচিত তাঁর দেওয়া শিক্ষা, শক্তি, শান্তি ও আশীর্বাদে পুষ্ট হয়ে এই চারদিন তাঁর আরাধনা করা। আমরা সবাই সেই চেতনায় জাগ্রত হয়ে ছুটে যাবো মন্দিরে মন্দিরে মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতে। মায়ের রূপের ছটা ও অপূর্ব শক্তি মূর্তি দর্শনে আমরা সবাই হবো ধন্য। তাঁর আশীর্বাদে আমরা শক্তিমান হয়ে সাড়া বছর আমরা বিভিন্ন কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বো। মায়ের চরণে প্রণাম করে আমরা সবাই সেই আশীর্বাদ গ্রহণ করবো। মা যেন আমাদের হৃদয়ে চির স্মরণীয় হয়ে অবস্থান করেন। এই পূজার দিন গুলিতে এই হোক আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

প্রতি বছরের মত এবারও পার্থে "মায়ের" উপাসনায় উদ্যোগী সবাই কে আমি স্বাগতি জানাই। তাঁরা যেন সুন্দর ভাবে "মায়ের" পূজানুষ্ঠান সম্পাদন করতে পারেন।

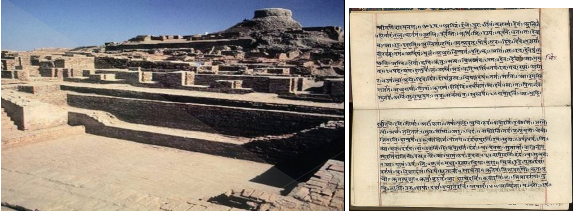
পরিশেষে সকলের শান্তি, শৃঙ্খলা ও দীর্ঘ জীবন কামনা করে মা কে প্রণাম জানিয়ে শেষ করছি।

-----o-----

Hinduism
- PrasunSarker

The Hindu religion is widely known as one of the oldest – if not the oldest – religion in the world. Practitioners and scholars often referred to Hinduism as *Sanatana Dharma*, or “the eternal tradition,” for this reason. Scholars regard Hinduism as a major influencer of various Indian cultures and traditions that are still celebrated today, and with 900 million followers Hinduism is the third largest religion in the world.

Hinduism didn’t just begin at one point with one person; it was a religion developed over thousands of years, formed by the fusion of the Indian cultures and traditions within the Indian subcontinent. Starting from before 2000 BC was the Indus Valley Civilisation, in which religion involved temple



rituals and ritual bathing. The traditions started in the Indus Valley were the foundation of Hinduism today.

The next period, the Vedic period (1500 BC – 500 BC) was an important stepping stone for the actual creation of Hinduism. In this period the *Vedas* were written. The Vedas are the most ancient and sacred texts of Hindu religion, composed in Vedic Sanskrit. There are four Vedas – the *Rigveda*, *Yajurveda*, *Samaveda*, and *Atharvaveda*. An important feature of Vedic religion was centred around sacrifice and sharing a sacrificial meal in the name of the many Gods.

From 500 BC to 500 CE came the Epic, Puranic, and Classical Age in which even more sacred texts were composed. These texts involved stories of the Gods, shown in the Epics of the *Mahabharata* and the *Ramayana*, and the stories in, the *Puranas*.

Many important ideas and beliefs central to Hinduism, such as *dharma* were presented in the texts known as the *Dharma Sutras* and *Shastras*. *Dharma* is a concept central not just to Hinduism – it is relevant in Buddhism, Jainism and Sikhism as well as Hinduism. *Dharma* signifies the behaviours which are in

correspondence with the order of life.The behaviours involve law, justice, truth, and more. The Medieval Period (500 CE – 1500 CE) was the period in which actual deities came to be – Shiva, Vishnu, and Devi in particular. There was development in temples such as the Jagannatha in Puri, Orissa, and more. These temples generally had a major deity which was primarily worshipped there. In this period many philosophers and teachers of the Hindu religion rose, and travelled throughout India, defeating scholars of other movements and establishing their own theologies.

More recently, in what is known as the Pre-Modern Period (1500 – 1757) Hinduism had become one of the major political forces in India. In other areas of the world, Islam was on the rise, and became a major political force of the Mughal Empire. In this period, there were developments on the devotional religion, expressed through writings in poetry, meditation, yoga and more.

Following the Pre-Modern Period was the British Period (1757 – 1947), when the British ruled India. At first, the British made no interference in Hindu culture, but eventually, missionaries preaching Christianity were sent to India, motivated by the desire to ‘westernize’ this culture. The 19th century did hold major developments for Hinduism though, in what is called the Hindu Renaissance. Reformers such as Ram Mohan Roy, Swami Vivekanada and Ramakrishna presented Hinduism as a rational and ethical religion, and Hinduism essentially became what it is today.



Hinduism has had a strong and powerful past. The religion’s influence has strengthened greatly over time and become a significant factor in the lives of many people all over the world. After so much observation in the history of Hinduism, we may now look forward to what awaits us in the future.

Operation Riverside - Prithul Bisshay

“Dispatch to Delta, all systems go?” Says the voice on the radio.
”Affirmative”says our squad leader,”
Conformation to drop ? ”. ” Affirmative.”

There is no turning back.We were assigned this.This is Delta’s time to shine.A squad of misfits that weren’t cut out for Alpha,Beta or Charlie.But I am starting to think this is a bit hard for a redemption mission.

“Look,I was assigned your commander because no one else wanted to.” Says Corporal Johnson.”Make yourselves useful.”
“Strong words for someone who just ranked up from Lance Corporal.”

That’s Krane,the wisecracker of the group, and he has a reason to be.He is only in Delta because the general is the rival of his dad’s company.If that wasn’t the case, he would be in Alpha.He is probably the best fighter in this group.

“You little-Look, did everyone read the mission briefing?” asked C.P. Johnson
Everyone put their hands up.
“Since you are probably lying,I will say it anyway.”Said John,blatantly ignoring the mission briefing in *MY HAND*.
“Ahem.Your mission is to find an alien artefact, in America-“John was saying, until i butt in
“*AMERICA?!WE ARE IN AMERICA?*”I say in pure confusion.Imean seriously,the briefing didn’t mention that!

“Yes, we are, Astrix. As I was saying, you have to find it before A.S.T.H.M.A or any other agency does, and they already have agents searching.”
“So, we are performing a H.A.L.O jump? Asked Trinity. Man, I have had the biggest crush on her since, well, Primary.
“Precisely!5 point’s to Trinity! Now that that is over with, ready to jump? Says C.J. Man,I cannot run outta nicknames for C.P.J.

The Supply door opened.
The Supply door opened. “3”
Everyone got their weapons “2”
We got on our parachutes. “1”
We prepared“GO GO GO!”
We are off! We checked if our comms were working. They were perfectly normal.

এবার বলি আরেক কাহিনী, দেখতে শুনতে তো আমি বেশী সুবিধার না,আবার ধরেন বেশভূষাও বিদেশী না অথবা পোশাকের মধ্যে কোন অভিজাত্য নাই আমার।তো আমাদের দেশের বিমান বন্দরের ইমিগ্রেন্ট পুলিশেরা আমাকে মনে করে বোধ করি মিডিলইষ্ট ফেরত শ্রমিক,ঝাড়ি মেরে কথা বলে,বিরক্তি দেখায় । যখন দেখে অস্ট্রেলিয়া থেকে আসলাম তাদের চোখ মুখের চেহারা পাল্টে যায় মুহূর্তে । এক মুহূর্তে এক চেহারায় আমি একই সাথে অবহেলা আর গুরুত্ব দেখার সুযোগ পাই । মনে মনে হাসি, বোঝে না অস্ট্রেলিয়া, কানাডা,আমেরিকার মতো উন্নত দেশে যারা থাকে তারা দেশে আসে শুধু মাত্র অবকাশ যাপনের জন্য।তারা জানে না এসব উন্নত দেশে বসবাসরত প্রবাসীরা দেশকে কিচ্ছু দিতে পারে না, শুধু নেয় । তারা জানে না উন্নত দেশে বসবাসরত উচ্চশিক্ষিত প্রবাসীরা দেশের সম্পদ এনে বিদেশে সম্পদ গড়ে।তারা জানে না মিডিলইস্টে বাস করা অধশিক্ষিত অথবা অশিক্ষিত প্রবাসীরাই মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখে,তারা জানে না সদ্য যুবা অথবা কিশোর ছেলেটা মরুভূমিতে খেটে খেটে দেশ গড়ছে।বাংলাদেশ বিমান বন্দরে এসব কিশোর অথবা সদ্য যুবাদের অনিশ্চিত ভিত্তি চোখের দৃষ্টির দিকে আমরা কী কখনো মনোযোগ দিয়ে তাকাই ?তাদের পায়ের মোটা বেল্টের স্যাঙ্গেল,নীল জীন্সের প্যান্ট, সাথে ইন করা শার্ট,কাঁধে ঝোলানো কাপড়ের ব্যাগ আরেক কাঁধে মায়ের বাপের মমতার হাত, আমরা কি দেখি কখনো? না, আমরা দেখি না।দেখি না বলেই আমরা ইন্টারন্যাশনাল পাসপোর্ট আর দেশী সবুজ পাসপোর্টের মর্ম বুঝী না, দেখি না বলেই কাঁধে ঝোলানো কাপড়ের ব্যাগ আর চকচক্কা লেদারের ট্রিলিব্যাগের পার্থক্য আমরা বুঝি না । আমার আসল চিনি না,শুধু নকল চিনি । আমরা ন্যাচারাল বুঝি না,শুধু চকচক্কা বুঝি । কেননা আমাদের তা বোঝানো হয় না,কেননা আমরা বুঝলেও না বোঝার ভান করি । আমরা শুধু বিভেদ বুঝি, বিভেদে কী স্বাধীনতারা থাকে !

ভালো থাক সবুজ পাসপোর্টেরা । বুঝতে পারুক তাদের মর্ম আমাদের স্বাধীনদেশ । মর্যাদা পাক, গুরুত্ব পাক,অবহেলা না পাক সবুজ পাসপোর্টের মালিকেরা । ভালো থাক দেশের চক্রজানেরা । ভালো থাক দেশ, ভালো থাক স্বাধীনতা ।



অনুগল্প: দীপা - আশিক বিশ্বাস

এই শোনো, এই শোনো!!
রুদ্র ফার্মগেট থেকে গ্রিনরোডের রাস্তা ধরে হাঁটছিল। জোরে জোরে ডাক শুনে পিছনে ফিরে তাকালো। পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে দীপাকে দেখে খুব অবাক হল। কলেজে তারা একসাথে দু’বছর পড়েছে। অনেকবার চোখাচোখি হলেও কথা হয়নি কখনো। কলেজে ওদের সাথে যত মেয়ে পড়তো দীপা তাদের মধ্যে নানা দিক দিয়ে সকলের কাছে আকর্ষণীয় ছিল। দীপার স্বভাবসুলভ চঞ্চলতা, উৎফুল্লতা, নিষ্পাপ চাহনি রুদ্রকে আকর্ষণ করত খুব। কিন্তু আগ বাড়িয়ে কখনোই দীপার সাথে কথা বলা হয়ে ওঠেনি। এই তোমার নাম রুদ্র না? রুদ্র অবাক হলো। তার ধারণা ছিল দীপা তার নাম জানেনা। তুমি কোন কোচিং এ ভর্তি হয়েছো? থাকো কোথায়? আমি উদ্ভাসে ভর্তি হয়েছি। এইরোডে একটি হোস্টেলে উঠেছি।আচ্ছা তোমার নাম্বারটা বলো।এখন খুব ব্যস্ত আছি, রাতে কল দিব। এক নিঃশ্বাসে বলল দীপা। রুদ্র ওর নাম্বার বললো। দীপা ওর মোবাইলে নাম্বারটি তুলে রুদ্রকে কল দিয়ে বলল নাম্বারটি সেভ করে রাখো, রাতে কল দিব। এই বলে বিদায় নিল।

রাত দশটায় রুদ্র দীপার কল পেল। কল রিসিভ করতেই বলল দুঃখিত তোমাকে প্রশ্ন করে উত্তর দেওয়ার সময় না দেওয়ার জন্য। এখন বলো কোন কোচিংয়ে ভর্তি হয়েছো এবং কোথায় থাকো? রুদ্র জানালো ও ইউসিসি কোচিং এ ভর্তি হয়েছে এবং আজিমপুরে থাকে। দীপা কথায় কথায় রুদ্রের কোচিং এর সময় জেনে নিল। তার সময়ের সাথে হিসাব করে জানালো উভয়ের কোচিং-এর পর তারা বিকালে ঘন্টাখানেক সময় পাবে ঘুরে বেড়ানোর। দীপা রুদ্রকে জানালো ঢাকায় কোচিং করতে এসে তার খুব একাকী লাগে, একঘেষেমি ও লাগছে কিছুটা। তাই রুদ্রের যদি অসুবিধা না হয় তবে তারা মাঝে মাঝে বিকাল বেলা ঢাকার দর্শনীয় স্থানগুলো ঘুরে দেখবে।রুদ্র এ প্রস্তাব পেয়ে খুব আনন্দিত হলো। রুদ্রের এটাই প্রথম ঢাকায় আসা। তাই সেও ঢাকার দর্শনীয় স্থানের তেমন কিছুই দেখেনি। রুদ্র দীপার প্রস্তাবে আনন্দের সাথে সম্মতি দিল।দীপা জানালো যে তারা আগামীকাল কোচিং-এর পর নভোথিয়েটারে যাবে।আরো কিছু কথা বলে গুত্তরাত্রি জানিয়ে কথা শেষ করল।

পরেরদিন রুদ্র ও দীপা তাদের কোচিং- এরপর নভোথিয়েটারে গেল। এভাবে তারা পর্যায়ক্রমে লালবাগ কেল্লা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, আহসান মঞ্জিল, জাতীয় জাদুঘর, চিড়িয়াখানা, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতিস্থান একসাথে ঘুরে দেখল। তারা খুব ভালো বন্ধু হয়ে গেল।এভাবে তারা ঢাকার একাকীত্ব ভুলে আনন্দেরসাথে পড়াশোনার সাথে সাথে সময় কাটাতে লাগল। তাদের মধ্যেই প্রতিনিয়তই যোগাযোগ হয়। তবে একদিন রাতে দীপা রুদ্রকে জানালো পরেরদিন যেন সে সারাদিন ফ্রি থাকে। তারা সারাদিন একসাথে ঘুরবে। রুদ্র কারণ জানতে চাইল। কিন্তু দীপা কারণ বলল না। রুদ্রকে বলল সে যেন পাঞ্জাবি পরে আসে। ঠিক সকাল দশটায় তাকে তার হোস্টেলের সামনে থাকতে বলে ফোন রেখে দিল।

পরদিন ঠিকসময়ে রুদ্র দীপার হোস্টেলের সামনে যেয়ে দিপাকে কল দিল।দীপা রুদ্রকে বলল সে দশ মিনিটের মধ্যেইআসছে।রুদ্র হোস্টেলের গেটের বিপরীত ফুটপাতে একটা চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে এক কাপ চা অর্ডার দিল। রুদ্র চা খেতে খেতে একটু

----- o -----

<div>মা দুর্গাকে নিয়ে দুটি গীতিকবিতা</div> <div>- তপন বাগচী</div>	<div>ভালো থাক সবুজ পাসপোর্টেরা</div> <div>- শরিফা টুলটুলী</div>
<p>১</p> <p>মা যে এলো ঘোড়ায় এবার, যাবে দোলায় চড়ে। কয়েকটা দিন সবার সাথে থাকুক বাপের ঘরে॥</p> <p>মায়ের সাথে কার্তিক গণেশ লক্ষ্মী সরস্বতী, মহিষাসুর পায় যে পূজা--জানে সকল ব্রতী শিব ঠাকুরও দাঁড়িয়ে থাকেন মাথারও উপরে॥</p> <p>ষষ্ঠীদিনে মায়ের বোধন হলো সায়ংকালে আনন্দে তাই সবাই মিলে নাচছি ঢাকের তালে মায়ের আগমনীর ধ্বনি ছড়ায় চরাচরে॥</p> <p>সপ্তমীতে ঘাটে ঘাটে কলাবউয়ের স্নান ম-পে আজ গাইছি সবাই গ্রিনয়নীর গান চতুর্দিকে খুশির ঝিলিক--উঠল হৃদয় ভরে॥</p> <p>অষ্টমীতে সন্ধিপূজায় উঠছি সবাই মেতে মায়ের প্রসাদ আমরা সবাই নেব দুহাত পেতে ঢাকের তালে সবারই মন খুশির নৃত্য করে॥</p> <p>নবমীতে মায়ের পূজা হলো যে নীল ফুলে যজ্ঞদানে মিলছি সবাই মনের বিভেদ ভুলে সবার জীবন সফল হবে মহামায়ার বরে॥</p> <p>দশমীতে মর্ত্য ছেড়ে মায়ের বিসর্জনে আনন্দ সব যায় মিলিয়ে, বিষাদ জমে মনে মায়ের গমনপথের দিকে নীরব অশ্রু বরে॥</p> <p>কৈলাশে মা চলে গেলেও ভক্তের মন্দিরে শরত এলেই দশভূজা আসবে আবার ফিরে যতদূরেই যাক চলে মা, থাকে এ-অন্তরে॥</p>	<p>বাড়ী থেকে আসার সময় শাশুড়ি বরই এর ”টক মিষ্টি আচার ” দিয়েছিলেন ।পার্শ্বের বিমান বন্দরের ইমীগ্রেশনের কড়াকড়ি, তাই বলেছিলাম দেওয়ার দরকার নাই,কিন্তু স্নেহ ভালোবাসার পরশযুক্ত আচার আমাদের সত্যি আনতে হল । প্লেনের ফর্মে আমরা ডিকলিয়ার করেছিলাম যে কুকড ফুড (রান্না খাবার) নিষি্ধ । অনেকের কাছে শুনেছি ”বেবী ফুড (শিশুর খাদ্য) ” বললে ওরা আর বাধা দেয় না নিতে। তো, আমরা পার্থ বিমান বন্দর ইমীগ্রেশনে পৌঁছছালাম । এক ইমীগ্রেনট মহিলা পুলিশ বিনয়ের সাথে জিজ্ঞেস করলেন ”এটা কী?” বললাম,”বেবী ফুড ” তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন ”হোয়াটস টাইপ অফ বেবী ফুড ? ”বললাম,”এটা অনেকটা আচারের মতো ।”তিনি ঋ কুঁচকে বিরক্তি আর রাগ নিয়ে ললেন,”বেবী ফুড কী করে পিকলের মতো হয় ? বেবী পিকল খায় ? তুমি এটা নিতে পারবে না, আমি সরি এটা আমাকে বিনে ফেলে দিতে হচ্ছে ।”ভাবলাম, আহারে শাশুড়ি বেচারি কতো ভালবাসা নিয়ে আচার বানিয়েছেন আর তা এই ভিনদেশের ডাস্টবিনে পড়বে ! ! বললাম,” তুমি ডাস্টবিনে ফেলে দাও,কিন্তু তার আগে আমি আমার দু হাত ভরে আচার নিতে চাই, আমি বাসায় যেতে যেতে খাবো, এটা খুব মজা,আমাদের দেশের মেয়ে বাচ্চা বুড়ো সবাই শখ করে খায়, তুমি ড্রাই করে দেখতে পারো। জানিনা মহিলা পুলিশের কী হল,বিরক্তিতে ভাজ হওয়া ঙ্গর চামড়া তার প্রশস্ত হল, তিনি বিশ্বাস ভরা চোখে বললেন,”না, থ্যাংকস আমি এটা খেতে চাচ্ছিনা,তুমি প্রীকেলের কনটিনারটা নিয়ে যেতে পারো । এটা ২০১৫ সালের ঘটনা ।</p> <p>এবার মানে ২০১৮ সালে যখন আবার বাড়ী থেকে ফিরছি শাশুড়ি কিছু লাল চাল দিলেন,যাকে বলে দীঘা ধানের চাল, শাশুড়ির মেজ ছেলে শখ করে ফ্যানা ভাত খায়।এবার সুদর্শন এক ইমিগ্রেনট পুলিশ ।স্ক্যানের চাল ধরা পড়লো (যদিও ফর্মে ডিকলীয়ার করেছিলাম চালের কথা) তিনি সব চালকে একটা বড় পলিথিন ব্যাগের উপর ঢাললেন । মেয়ের বাপকে বলছিলাম,”এখন কী এই লোক চালের মধ্যেকার কাঁকড় বাছতে বসবেন ! ! কিন্তু সত্যি সত্যি তিনি কাঁকড় বাছতে বসলেন এবং মিনিট তিনেক পরে চালের মধ্যে একটা ধান আবিষ্কার করলেন আর ধান যেহেতু সিড সেহেতু তা নিয়ে এই দেশে ঢোকা নিষেধ,এই একটা ধান তাদের কৃষির অথবা মাটির কতটা ক্ষতি করতেপারে সে কেবল তারাই জানে। তাদের সাবধানতা বিরাট পর্যায়ের । বিশাল ভূখণ্ড অথচ সেই তুলনায় লোক এতো কম, তারপরেও দেশ নিয়ে,দেশের মানুষ নিয়ে অস্ট্রেলিয়ান প্রশাসনের বিরাট ভাবনা । রান্না করা বরই আচারে অথবা বরইয়ের বীচে নতুন গাছ হবে না, নিশ্চিত করে, ভেবেচিন্তে, প্রশ্ন করে, উত্তর পেয়ে তবে তারা ছেড়ে ছিলেন,আর একটা ধানের জন্য ঘুপ্ত করে দুই কেজি শখের লাল চাল ডাস্টবিনে অতি বিনয়ের সাথে ফেলে দিলেন ।</p> <p>আর ওদিকে দেখুন আমাদের বাংলাদেশ ...প্লেন থেকে নামলেন আর আপনি রাজা ।কোন সমস্যা নাই, গা- গতর - শরীর, খাবার কোন কিছুতেই কোন সমস্যা নাই,কোন চেক,ফেক,টেকের ঝামেলা নাই । আপনি হাতি ঘোড়া নিয়েও বিমান বন্দর দিয়ে বের হতে পারবেন, খালী জাস্ট তারা দেখবে আপনার পাসপোর্টটা । যদি ইন্টারন্যাশনাল পাসপোর্ট হয়, তবে তো কথাই নাই!</p>
<p>-----o-----</p>	<p>২২</p>

“Dispatch to Delta, are comms functional?”
“Affirmative”Says M.I.K.A(Modular Interactive Killable Artillery)
“Roger. You know the drill.”
“O! hell yeah!” says Krane
“NOW!” I shout out.
This is AMAZING.A 4 persons team(Corp J didn’t want to come.It would ‘Hurt his dignity’)dropping into a war zone of hail fire and awesomeness.Wait..
“Guys, this is four agents against who knows how much.” I say, “We might want to be stealthy
-----o-----

I Don’t Know

- Gourab Sharma

I don’t know is a very common statement that people like me say, a 12 years old boy. I don’t know, means to not know what to do, but why do we so commonly say it. I don’t know is really the exception for yes or no. Why can’t we have one answer that is right. I don’t know. Neuroscience has proven whenever someone asks you a question you only think about so it does not activate all the memories and emotions in the amygdala. Indicating that you are only thinking about the question. Does this display that whenever you say I don’t know you are not concentrating on whatever you are asked but on somethingelse.

I know that maybe you genuinely don’t know the answer but there is a highly likely chance that around your brain there is an answer, it might not be right but it must be relevant.



Chittuargrh Fort

Ananyna Sharma

While I was visiting Rajasthan, we went to a fort called Chittaurgarh Fort. The reason why I was so interested in this fort was because I had recently seen a film about the history of it, Padmavat. I wanted to discuss the invasion of the Chittor fort by Alaudin Khilji in 1303 AD, who was the first invader of the fort.

This story has also been eternalised by the epic poem written by Malik Muhammad Jayasi, Padmavat. Rani Padmini was the second queen of Rawal Ratan Singh who both lived with their subjects in the massive Chittaurgarh Fort. One of his subjects, Raghav Chetan, was a sorcerer disguised as a musician and one day, he was caught performing sorcery which was an illegal act and was banished from the kingdom by the king. As soon as he was banished, he took refuge in Delhi which was controlled by Alaudin Khilji. Slowly, Chetan attained the Sultan’s trust and so he began singing praise of Queen Padmini’s beauty.

Naturally, the Sultan was intrigued by this beautiful woman who lived in Chittor and so he marched to Chittaurgarh and set up camp outside the fort. He asked Rawal Ratan Singh that he had come to catch a glimpse of his queen and then he would leave. The request made the King uncomfortable as Rajput custom didn’t allow women to meet strangers. However, he knew that making the Sultan angry would lead to an attack so he agreed to the demand. Queen Padmini didn’t want to meet face-to-face with the Sultan so mirrors were arranged so that the Sultan could see the queen’s reflection. With one look, the Sultan decided that he would not leave until he had Padmini as he was entranced by her beauty.

Rawal Ratan Singh accompanied Khilji back to his camp and when they were far enough from the fort, Khilji captured Rawal Ratan Singh and sent a message to the palace, stating that if they wanted to see their king alive, Padmini would have to come with him to Delhi. Gora and Badal, two loyal generals of the king, devised a clever plan to rescue their king. They sent word to the Sultan that Padmini would go with him and so the next day, over one hundred palanquins

Khilji was furious when he realised that he had been tricked so he cut off all supplies that led to the Chittor fort. Slowly, food, water and other supplies began to run out so Rawal Ratan Singh decided that the Rajput warriors would face the army outside. The courageous warriors vowed to sacrifice their lives for their pride and their king. Unfortunately, the Rajput army was insignificant compared to Khilji’s army and were all slaughtered. With the Sultan’s victory inevitable, the woman of the palacechose to commit jauhar over a life of humiliation and ill-treatment. Sadly, this was not the only time this happened. Jauhar was committed three times in the Chittaurgarh Fort. Thus, this act displayed the strong will of both the Rajput men and women.



-----o-----

The Power of Girls

- Riana Debnath

Once in Bangladesh lived a girl called Shima. She was about ten years old. She was the most pleasant girl in the town although she was born in a poor family. She helped everyone and was never rude. Shima always prayed to God. She knew that one day God would help her family. Her father worked long hours every day selling dresses but sometimes that wasn’t enough to feed the family. One day her father told her that she needed to start school right away or she wouldn’t learn anything. There was a problem though. All the free schools were full.

There was only one school left and it was dominated by some rude boys. Her dad had no choice but to send her there. The next day Shima went to the school and didn’t have a good day. All the boys teased her. They said that girls are inferior to boys. Shima was very offended. She always told girls that boys were not better than them, and that girls could become whatever they wanted to, if they worked hard.

Shima started thinking of ways to get back at the boys. It was already night and Shima still did not have a plan. As she laid on her pillow, she found that it was bumpy. She found a note under the pillow that said ‘Think of Durga Maa’. The next day Shima told the boys a story. It was about a monster that did great things and was awarded with a wish. The monster wished that no man could defeat him. Then he turned bad and wanted to take everything in the universe. The male Gods couldn’t do anything, so they called Durga Maa. There was a huge battle but Durga Maa won over the monster.

After the story Shima told the boys that girls could be as powerful as boys, and sometimes, even more powerful. The boys got terrified, stared at Shima and ran away. They never ever bothered her again. A month later at Durga puja, Durga Maa showed up and awarded Shima a wish for anything because Shima had done a good thing. Shima wished that her family would have a happy life. Durga Maa granted that wish and Shima’s family had a lovely life. As always, Shima was very much grateful to Durga Maa.

-----o-----

অনুরাধা মুখোপাধ্যায়ের কবিতা

আমি রাত্রি

আমি মোমবাতি
একা একা কাঠের টেবিলে
জ্বলে জ্বলে গলে
শেষ হয়ে যাওয়া
এক রাত্রি
কখনো পাশে থাকে
কাঁচের পাত্র লাল সুরা ভরা
আমার শিখা তার স্বচ্ছ গায়ে
পড়ে ছড়িয়ে দেয়
লাল নেশার স্বপ্ন
আর তার পাশে জ্বলে জ্বলে
শেষ হই আমি
এক রাত্রি

সেতারের মৃদু সুর
সাথে ঘুঙুরের বুম বুম
আমার মায়াভরা আলো
দীপ্ত করে এক জোড়া
জলভরা দিশাহারা চোখ
আর আমি জ্বলে জ্বলে নিভে যাই
অসহায় আমি
এই রাত্রি

সূর্যের প্রথম আলো
রোজ এসে পরে টেবিলে
আমার গলে যাওয়া শবের ওপর
বাতাসে থাকে মৃদু রেশ
পোড়া সলতে আর রজনীগন্ধার
আর আমি নিঃশ্ব হয়ে
পড়ে আছি ওই টেবিলের ওপর
আমি রাত্রি।

ফেরা

কতদূর চলে এসেছি
মনে মনে আর উপস্থিতির হিসেবে
এত দূর যে পিছনে যাব বললেও যাওয়া হয়না

একি রকম এগিয়ে চলা
এই চলার শ্রোত এতো
কেন তীব্র যে থামতে চেয়ো
থামা যায়না কিছুতেই
হাত বাড়িয়ে ধরতে চাই
ফেলে আসা সুন্দর প্রিয়জনের
স্মৃতিগুলি আর তারা
ভাসতে ভাসতে দূরে
চলে যায় নাগালের বাইরে
চাইলেও যায়না তাদের ধরা

এ কেমন পথচলা
চলার গতি শুধু
ঝড়ের ঘূর্ণিতে ফেলে
পিষে দেয় সব অতীতকে
ঠেলে ঠেলে নিয়ে চলে
এক খাদের প্রান্তে
পিছু ফিরে বারে বারে
ফিরে দেখি সেই সব
ফেলে আসা স্মৃতিগুলো
হেঁড়া মালার মুক্ত হয়ে
ছড়িয়ে পড়েছে অভিমানে
আমার ফেলে আসা
পথের প্রান্তরে।

ভালবাসার মুক্ত

সাগরের তীরে দাঁড়িয়ে
এই রাতে
তোমাকে দেখি হাতের পাতায়
মেলি ধরে অন্ধকার দিগন্তে
আর চাঁদের নিষ্ঠুর ঝিলিক যেন
আগুন ধরায় তোমার শ্বেত
মোমমাখা শরীরে
কাল সারারাত
তুমি ছিলে নিমগ্ন
আমার রঙ্গীন সুরার পায়ে সুরার দেওয়া রঙে
রঙ্গীন হয়ে বিলিয়ে দিয়ে ছিলে
শ্বেত শুভ্র নিজেকে
আর আমি ওই কাঁচের গভীরে
তাকিয়ে ছিলাম তোমার দিকে
শুভ দৃষ্টির আশায়
ওগো মুক্ত
আমার ভালবাসা
মোমবাতির নরম আলোতে
লাল সুরায় ছিল
আগুনের ফুলকি আর তুমি
ছিলে নিমজ্জিত সেই
লাল আগুনে
সাদা গোলাপের মতো
মৃদু মৃদু চুমুকে
আমি এসেছিলাম কাছে
তোমার আর শেষ চুমুকে
ছিল আমার চুম্বন তোমাকে
ওগো মুক্ত
এখন এই রাতে
সমুদ্রের আকুল গর্জনে
দিলাম বিদায় তোমাকে
ওই অতলে বিনুকের কাছে
যাও তুমি যাও ফিরে
ওগো মুক্ত
আমার ভালবাসার
একটি রাতের শ্বেত মুক্ত।

মা

- ইঞ্জিনিয়ার মনোরঞ্জন গোস্বামী

প্রনাম রাখি মা চরণে তোমার,
তুমি ছাড়া নিঃশ্ব এ বিশ্ব সংসার।
মন্দিরে মন্দিরে গেছি দেখেছি ঠাকুর,
খেয়েছি সুস্বাদু কত প্রসাদ প্রচুর।
নয়নে হেরিয়া রূপ পেয়েছি যে সুখ,
তবুও পড়েনি চোখে জননীর মুখ।
পৃথিবীর শেষ প্রান্তে সমুদ্র সৈকতে,
মনোযোগী ছাত্রবৎ ছিনু কান পেতে।
শ্রবণে পশেনি কভু মাতৃ-আহ্বান,
কেহ না উচ্চারিল 'হে মম সন্তান'!
মৃদুমন্দ বায়ে কত মধুময় ধ্বনি,
কর্ণ কুহরে বাজে মধুতর শ্রুনি।
ততোধিক শ্রুতিমধু মাতৃ বচনে,
শতকোটি প্রনতি মা তোমার চরনে।

-----o-----



ওড়া শেখা হল না

- ইন্দিরা চন্দ

সেই সময়,
পাখীদের সাথে আড্ডা হত
ওরা শোনাতো দেশ বিদেশের গল্প
বয়ে নিয়ে আসতো
নতুন ফুলের গন্ধ
হরেক রকম ফলের স্বাদ

পাখীদের সাথে বসতো গানের আসর
শিখে ছিলাম ভোরের কলতান
গাইতাম সন্ধ্যায় ঘরে ফেরার গান
একটু একটু করে শিখেছি ভালবাসা
শিখেছি বাসা বাঁধতে
আদরে জড়িয়ে থাকতে।
তবু নীল আকাশে মুক্তির আনন্দ
জেনেও স্বাদ পেলাম না তার
কারণ ওড়া শেখা হলনা

যখন নীল আকাশের দিকে তাকালাম
তখনই পাখীরা মিলিয়ে গেল আকাশে
আর মানুষের কালোকালো মাথাগুলো
ঘিরে ধরলো আমায় ...
ওদের কোলাহলে হারিয়ে গেল ডানার ঝাপট
মানুষের উষ্ণতায় মানুষের কাছে আত্মসমর্পণ
তাই আর ওড়া শেখা হলনা....

তার বদলে শিখলাম মানুষের ভাষা
হাসি - কান্নার, রাগ- অনুরাগের, ক্ষমা-ঘেম্মার
মিল-অমিলের, বুঝ-অবুঝের
উন্নত প্রানীর অদ্ভুত ক্ষমতা
কালো কালো অক্ষরে মাথা গেল ভরে
অক্ষরগুলো শব্দের রূপ নিল
ধীরে ধীরে আমার কণ্ঠ থেকে জিহ্বার পথ হয়ে
অন্য মানুষের কানে গেল...
আরোঅক্ষর, আরোশব্দ, আরোকথা
মানুষের ভাষা মানুষের মত করে বলে মানুষ হলাম

ভুলে গেলাম পাখীর শেখানো সুর
তাদের মিষ্টি, কর্কশকলতান
সেই ভালবাসার বাসা
নীল আকাশে মুক্তির স্বাদ
আজ আমি পরিপূর্ণ এক মানুষ
কিন্তু উড়তে পারিনা
আজও ওড়া শেখা হলনা আমার
তাই মাটিতেই বাঁধা পড়ে আছি...

-----o-----

The Unknown Present

- Adipta Dewanjee (Ushno)

One winters time, a 9-year-old boy called Zack was getting some Birthday Invitations Ready Birthday which is tomorrow.

That afternoon, Zack and his Mum went to the post box at their local shopping centre. When Zack and his Mum were walking from their local post box to their house. While they were walking home Zack and his Mum walked past a very strange looking house. There was four things Zack thought about the house.

- 1.It was terribly old.
2. It looked very ghastly.
- 3.It was really crooked
4. Why was the house's number 1475?

When Zack and his Mum arrived at their house, it was soaking outside. Zack and his Mum were getting everything ready for Zack's Birthday. That night, Zack and his Mum had mashed potato for dinner. Zack went to sleep at 8:20pm. Zack's Dad came about 10 minutes after Zack went to sleep.

That morning, Zack and his family all woke up at the same time and made a few finishing touches on Zack's party. After they did all of that they realised there was 30 minutes until everyone will come. So, they waited for 30 minutes. When all of Zack's friends came, they put their presents they brought for Zack in the spare room (which Zack and his parents hardly ever used). Zack's Birthday Party is going on from 12:00pm- 4:00pm. Zack and his friends had so much fun at Zack's Party. Zack and his parents had set a lot of things for Zack's Birthday Party.

- 1.Face painting
2. Playing sports outside
3. Pass the parcel
4. Musical statues
5. Musical bobs
(Of course cutting Zack's Birthday cake)
6. A running race
7. Dance contest
8. Art

After, everyone did all of that all of Zack's friends went home. When all of Zack's friends went home Zack went into the spare room and saw that there were 11 presents (by the way he

had no track of how many people came to his party). There was a present from Lucy, Brandon, Ryan, Harley, Jasmine, Sharon, Nick, Ashlee, Thomas, Connor and 1475.

So, Zack's Mum opened the door there was a really loud creaking sound while the door opened (Zack shut his ears when that happened). An old man was at the front door and said "did you like the Birthday present I gave you Zack". Then he quickly said "oh yes you don't know me I am Brandon's Grandpa and Brandon said that it was your birthday to me about 2 days before your party so I decided to get you a present and I told Brandon to give it to you when it was your party and I wrote my house number on it because I know you would not know me". "Thanks" said Zack in a delightful voice.

When Zack and his Mum arrived home, Zack opened the present and there was what Zack always wanted... an iPad Pro!!!

-----o-----

My Brother

- Promiti Sarker

My annoying brother
Gave me a lemon
And said to me,
"Try it!"
I told him,
"No! I will not try it!"
And dumped it on his head.

Now my brother was very angry
He wanted pure revenge.
Late at night when I was asleep
He put oranges on my head.

The next day I told him,
"I have a surprise for you!"
And he was daft enough
To believe me.
He opened my present
And to his surprise,
A blob of green goo
Squirted at him!

My annoying big brother
Had been defeated by me,
'The Annoying Little Sister!'
And finally, I had enough proof to say,
I am smarter than my brother.

-----o-----

Seat 13

- Rijuta Das

The scorching, red sun slowly rose over the vast land of Australia. Everyone was enjoying Saturday morning sleeping in at home. Though, there was one person who woke up at dawn, feeling as unsatisfied as she could ever be. Her name was Leena.

Leena was about to embark on a trip with her family to Bangladesh for Durga Puja and to visit her grandma. Uncertainty had filled her on the days leading to the journey. She had never been on a plane in her whole 12 years of living therefore she had so many doubts swimming around her head. Regret approached her as she took slow steps towards the airport. Oh, how wonderful her weekend could have been.

Leena's family had just arrived at the airport. As usual they were overdue. The scene was bedlam. Mum and Dad were quarrelling over who had the ticket. The twins were having a trolley marathon with the cluttering luggage. Leena was just standing in the corner, crossing her finger in the hope they had misplaced their tickets and that no one detected she was a part of the family. By now everyone had started gaping at the eccentric family commotion. Though there wasn't a whole heap of people at the airport, there were enough people gazing to make Leena feel mortified at having such a family.

When Leena had finally managed to herd her brothers, her parents were convinced that they had lost their tickets and were about to head back. Leena was so relieved, she did a little happy dance. Just then such an event occurred that would change Leena's life. The person sitting at the desk came towards them. She was wearing a knee-length maroon skirt, a white long-sleeved shirt and a red smart-looking jacket. Overall Leena thought she looked like a business woman with too much lipstick. She approached the family and started saying, "Hello my name is Sandra. I heard you have lost your tickets (Leena winced). I've got some spare tickets for free. Would you like them?" Dad happily accepted. Looks like Leena's chances of a relaxing weekend were gone.

After completing the customs and immigrations the family boarded flight AA2105 Perth-

Kuala Lumpur. The plan was that Leena's family would land in Kuala Lumpur and catch the next plane to Dhaka as there was no direct flight from Perth to Dhaka. As they boarded Leena thoroughly inspected her surroundings. Here are some of the peculiar things she noted...

1. There's a strange looking man at seat 13
2. The head air hostess gives children death stares
3. Economy class (where Leenawas sitting) doesn't have any televisions

The first activity Leena carried out to occupy herself was to watch television on her phone. Luckily the plane had adequate Wi-Fi. When brunch time arrived Leena had another very unpleasing encounter with the head air hostess. When she had come to deliver food to Leena's family, Leena's brothers had sneaked a pretend spider onto the brunch tray. The air hostess was afraid of spiders therefore she dropped the tray with a crash. Leena knew the air hostess thought she did it as the air hostess kept on glaring at her.

Meanwhile in the cockpit trouble was erupting. "Frank did you check the fuel levels before we left Perth," pondered the pilot to his co-pilot while trying to concentrate on flying the machine. "Um I can't remember," replied the confused co-pilot, "I'll check now." That was the minute panic started in the cockpit soon to spread throughout the whole plane. "Head air hostess please come here," commanded the pilot. The head air hostess obeyed. The co-pilot whispered something into her ear. The air hostess almost fainted in alarm.

"Quiet down Zip and Zap they're going to make an announcement," Leena scolded her brothers. The children-hating air hostess looked agitated so Leena didn't want to miss the message. "Now passengers," she started in a most trembling voice, "Don't fear too much but our engine doesn't have enough fuel to land at our destination and there is a teeny weeny chance we might crash." Looking at the passengers distressed faces she added, "Don't worry we are making arrangements and there is a low chance we will actually crash."

Fear struck the room like lightning. People fainted others threw up. One thing everyone knew though was that the flight crew were giving them false assurance. At this rate they were bound to crash and there was no stopping it. Leena viewed as people panicked. Even some

তৃতীয় লিঙ্গ

- সোনালী সরকার

পিতা নহি মাতা নহি, নহি কন্যা, পুত্র জায়া
শরীরে মোদের জড়িয়ে আছে এসবের আলোছায়া।
দেখলে মোদের তোমরা সবাই বিদ্রুপ করো, হাসো
ভালোবেসে কেহ বলে না মোদের, একবার কাছে আসো।
অবহেলা আর ঘৃণায় তোমরা দাও দূরে ঠেলে ফেলে
নিলেনা তো আজও, তোমরা সবাই মনে ভরে কোলে তুলে।
জন্ম আমার আজন্ম পাপ, দিলে তাই দূরে ছুঁড়ে
কোলেতে তোমার ঠাই হলো নাকো রাজপথে মরি ঘুরে।
জন্মের পর সিক্ত করোনি মনে প্রেম ভালোবাসায়
তাইতো মোদের ঠাই হলো শুধু আন্তাকুঁড়ে, রাস্তায়।
মমতাময়ীর গর্ভে জন্ম, তোমাদেরই মতো আমি
নিষ্পাপ হয়ে পাপী যে হলাম তোমরা যে হলে দামি।
কতো দুখো জ্বালা, চেপে রেখে বুক, হেসে খেলে পথ চলি
ক্ষুধার অন্ন যোগাতে যে মোরা, খুঁজে ফিরি অলিগলি।
কখনো বা সখা, কখনো বা সখী, কখনো মেহের বোন
মিছে মিতালী তোমাদের সনে থাকবে কতোক্ষণ।
তোমাদের সুখে জ্বালা ধরে বুক, ধুঁকে ধুঁকে মরে যাই
কেনো যে বিধাতা সৃজিল মোদের, উত্তর নাহি পাই।

বঞ্চিত মোরা শিক্ষা, চাকরি, মাতৃদুগ্ধ পানে
হাতে রেখে হাত, পাশে থেকে কেউ, লড়বে মোদের সনে।
মানুষ হয়েও পাই না তো মোরা মানবের অধিকার
মাথা উঁচু করে, খেয়ে বেঁচে যাবো, এটাই অঙ্গিকার।
হে সন্তান মানব সমাজ, সন্তান মানব জাতি
অধিকার আর ভালোবাসা দিলে, বলো কী তোমার ক্ষতি।
ব্যথা ভরা বুক হাহাকার নিয়ে, করি শুধু আত্ননাদ
দাও দাও দাও, একবার দাও, দাও সমতার স্বাদ।



HE TAX INSTITUTE
CHARTERED TAX ADVISER

CHARTERED ACCOUNTANTS
AUSTRALIA • NEW ZEALAND

QUALITY IS OUR MISSION.

Tax Return
From \$77

- Taxation
- Accounting
- Business Services
- All Tax Returns
- Quick Refund
- Open 7 Days
- After Hour Appointment Available

Please call for a free first consultation >>> **DKD ACCOUNTING**

Deepok Kar CA
Principal

Office
4A Hove Court, Nollamara WA 6061
Tel: +61 8 9440 0791
Cell: +61 413 748 338
Email: deepokkar@gmail.com
deepokkar@yahoo.com

© 2017 DKD Accounting. All Rights Reserved

নেমে আসতে সময়নিলো ৩ দিন সেই একই রুট দিয়ে। কাঠমুন্ডু পৌঁছে প্রথম কাজ ছিল একটা হট শাওয়ার নেয়া— oh, what a feeling!!

কিছুঅতিরিক্ততথ্য (in english) নিচে দেয়া হলো কেউ যদি ক্লাইম ব্যাপারেইন্টারেস্টেডহয় :

How long does it take from Everest base camp (BC) to reach summit (8848M)?

This is taking a somewhat acclimatized person with good fitness as the baseline. Someone who didn't acclimatize well, lacks the necessary fitness, or has an ailment (hypobaropathy, eye problems, etc.) will take significantly longer.

First Leg,BC across Icefalls: 6 hours. If everything else works out, you don't have to segue because of an unstable wall or something nasty happening, you should be in Camp 1 after about six hours.

Second Leg, Valley of Silence to Camp 2: About four to five hours. If all fixed ropes are set and you're not in a traffic jam up (as has happened a lot in 2011 and 12, and

was one of the reasons the 1996 expedition turned so deadly), you'll be across this drudgy place quickly.

Third Part, up to Camp 3, Lhotse Wall: About 6 hours get you from Camp 2 there. Again, this is assuming you'll be able to just do your thing, and it's not a fun place to be.

Death Zone, Camp 4: Your last stop before the summit. It usually takes at least six hours, often longer, because now you're fighting diminishing oxygen, the stress and exhaustion from the previous legs, and a lack of sleep.

Summit, if you manage to get out before midnight, you're in luck. Usually Knife Ridge isn't as sharp in the early hours and only whittles down as the early morning progresses. If Hillary Step isn't backed up, you'll be done and one summit pin richer in about 10 to 14 hours. If you can't make it to summit before 1pm you won't make it, so there's very little that can extend this legunless bad stuff happens.

-----o-----

of the air hostess' could not be brave anymore. Other air hostess' tried to comfort passengers. This was exactly what Leena was afraid would happen.

There was another person on the plane who was equally as anxious as Leena. That was the person sitting at seat 13. He knew if anyone could rescue this plane it was him. Though there was a problem. The man thought and thought and thought but nothing came to him. Just then he spotted Leena trying to comfort her mother. He grinned a sly grin.

Leena was wondering around the empty cabins of the aircraft. "Why, why, why," she thought to herself. Why did this have to happen to her? She had called her grandma and told her about the whole situation. Suddenly she stumbled upon the man at seat 13. He was carrying a walking stick that Leena had seen blind people carry around. Everything then made sense to Leena. The man at seat 13 was blind." Here I want you to have this," he said holding out an old-looking book." A magician once gave it to me. I can't read it so I want you to have it. It might help you save this plane," he concluded. Handing Leena the book, he turned around and went away.

When Leena opened the book, she saw it was a children's book. She had the sensation that there was a puzzle to the book. She called her grandma, using WhatsApp, and told her everything. Her grandma told her in the olden daysif anyone wanted to write a secret message they would write it in an invisible inked pen. That gave Leena an idea. She turned the flashlight on her phone on and like magic the children's book words vanished and secret magic formulas appeared.

Leena carefully read the book. The plane was now a human- span away from crashing. Leena had finally found the perfect spell. If she recited this incantationproperly the plane would crashbut the travellers would survive. Leena started rapidly repeating the spell. She finished just in time. As she finished the last word the plane crashed.

The passengers were getting ready to die. You wouldn't believe their astonishment when they had found out they all survived. Everyone started celebrating. Leena's mother started looking for Leena to join the celebrations. When she finally saw Leena she was shocked. "Everyone come here," she said in a shattered voice. They all saw Leena flat on the floor. She had deceased.

In the meantime, Leena's grandmother was trying to figure out the secret behind the mysterious man at seat 13 and the book. Leena had called her when she found the formulas in the book but there was something unusual about her voice. Grandma felt like something didn't add up. Just then Grandma's phone rang. She picked up the phone call and heard everything. She sank into the nearest sofa. It was a call from Leena's mum saying that Leena was no more. All of a sudden it all made sense to Grandma. The person at seat 13 wasn't blind. He could see everything and knew the spell. In the book it was written the person who cast the spell would have to die. The person at seat 13 gave Leena the book because he knew if she owned it she would risk her life to save the plane. "I'll find you whoever you are, wherever you are," Grandma whisper- sobbed. Tears clinged to her eyes as she lay down falling into a deep slumber.

-----o-----

Silence

- Promiti Sarker

Through my room's skylight,
As dark as the night
I silently watch
As the birds start their flight.

They swoop past the tree
Still not seeing me
I silently watch
For they did awake me.

-----o-----

Paul Tax & Accounting Services

Individual Tax Return from \$50

- > Rental Property Tax Return
- > Company, Partnership, Trust and SMSF Tax Return
- > Company, Trust and SMSF set up
- > Tax Planning > Small Business Setup
- > GST Return > Bookkeeping Services

Contact: 0433003415

Biplab Paul

Paul Tax and Accounting Services

Registered Tax Agent and Public Accountant
Masters of Accounting (Central Queensland University)
M.Com (DU) B.Com (Hons) DU
Email: paul_biplab7@yahoo.com.au

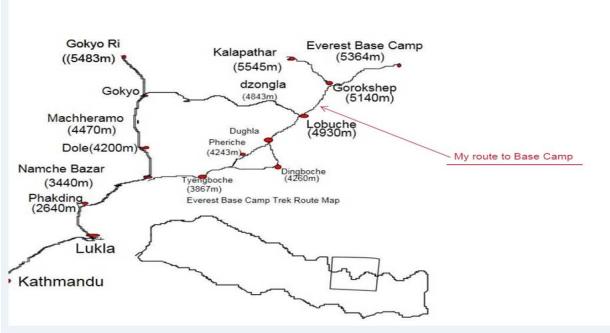
ট্রেকিং অভিজ্ঞতা – মাউন্ট এভারেস্ট বেসক্যাম্প

- সাব্বির হোসেন

২০১৫ সালে আমার প্রথম নেপাল আসা হয়, হিমালয় রেঞ্জ এর পর্বতমালার সাথে তখনি প্রথম মুখোমুখি, যদিও অনেক দূর থেকে। পোখারা থেকে ২দিন ট্রেকিং করে আমরা প্রথমে পৌছাই অস্ট্রেলিয়া camp-এ (সিলেভেল থেকে প্রায় ২৫০০ মিটার উপরে)। ভোর পাঁচটা বাজলে গাইড ডেকে তুললো - স্যার, আকাশ একদমপরিষ্কার, হিমালয়ের উপর সূর্যোদয় দেখার এইসুযোগ! ছেলে, মেয়ে, স্ত্রী সবাইকে ডেকে তুললাম – বাইরে তখন শূন্যের কয়েক ডিগ্রী নিচে তাপমাত্রা, তাড়াহুড়ায় ওরকম কাপড় চোপড় ওনা পরে চলে এসেছি । কিন্তু পর্বতমালাকে সচক্ষে দেখার সুযোগ পেয়ে সব ভুলে গেলাম। এ এক অনন্য অভিজ্ঞতা – সূর্য যেন একের পর এক পর্বতগুলিকে জাগিয়ে তুলছে - অল্পপূর্ণা, কাঞ্চনজঙ্ঘা, মাকালু, লাহাটসেতারপরে যেন পালা এলো এভারেস্টের যদিও এভারেস্ট ছিল সবার পিছনে।

আমাদের গাইড বারোদিনই আমাদের সাথে ছিল এই নেপাল ভ্রমণে – ওরই কাছ থেকে কিছুকিছু ধারণা পাওয়ার চেষ্টা করলাম এভারেস্ট নিয়ে – কতদূর /কিভাবে উঠা যায় বা অন্য কি অপসন আছে ইত্যাদি, মনে মনে কিছু হিসাবও করে রাখলাম। ২০১৭ সালের এপ্রিল মাসে এল একটা সুযোগ – ফ্যামিলিকে বলাতে প্রথমেই না, শেষ পর্যন্ত রাজি হলো, কন্ডিশন একটাই - জাস্টবেস ক্যাম্প পর্যন্ত ট্রেকিং করা যাবে। ছেলে (Rashique) একটু বঁকে বসলো তাকেও নিতে হবে। শর্ত দিলাম একটা ফ্রেন্ডকে জোগাড় করার জন্য। যদিও শেষ পর্যন্ত আমি একাই বুকিং দিলাম – ডিসেম্বরের ৯ তারিখে নয়জনের এক গ্রুপের সাথে।

মাউন্ট এভারেস্ট প্রায় ৮৮৫০ মিটার উঁচু, এর চূড়ায় (সামিট) উঠতে হলে চারটি ক্যাম্পপার হতে হয় – ক্যাম্পগুলো হচ্ছে রাত্রের থাকার জন্য। বেস ক্যাম্প যারা ট্রেকিং করে (আমাদের মতো), তারা ৫৪০০ মিটার যাওয়ার পরে আবার ব্যাক করে। আর যারা সামিট-এ উঠতে চায় তাদেরকে যেতে হবে ক্যাম্প ফোর পার হয়ে সামিটে - ৮৮৫০ মিটার উপরে। নিচের ছবিটি দেখলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে ।



ডিসেম্বরের ৭ তারিখ রাত দশটায় কাঠমুন্ডু পৌঁছাই, পরের দিন ছিল বিশ্রাম, শপিং আর টীম মিটিং। আমার সময়টা ছিল খারাপ, শীত শুরু হয়ে গেছে আর শীত মানেই রক্ত হীম করা শীত।

থেকে তাই ভাড়া করলাম স্লিপিং ব্যাগ আর ডাউন জ্যাকেট । ট্রেকিং কোম্পানি আমাদের প্রত্যেককের জন্য বরাদ্দ করলো ১৫ কেজি ওজন যেটা আমরা একটা duffel বাগে ভরে পোর্টারকে দিলাম – প্রতি দুইজনের জন্য ছিল একজন পোর্টার সুতরাং সে বহন করতো প্রায় ৪০ কিলো ওজন তার পিঠে । আর আমরা একটা ব্যাক প্যাক-এ আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস ট্রেকিং এর সময় বহন করতাম যেটার ওজন ছিল প্রায় ৮/৯ কিলোরমতো ।

৯ তারিখ ভোর ৪ টার সময় উঠে নাস্তা খেয়ে সোজা এয়ারপোর্ট, সেখান থেকে একটি ১২ সিটের সেশনাতে করে পৌঁছলাম Lukla এয়ারপোর্টে (৪৫ মিনিটের ফ্লাইট)। Lukla কেবলাহয় ওয়ার্ল্ডের মধ্যে scariest এয়ারপোর্ট – প্রায় ১০ মিটার এর একটা স্ট্রিপ এর মধ্যে সেশনা ল্যান্ড করে, দুই পাশে খাড়া পর্বত, একটু ভুল হলেই হয় এম্পার না হয় ওম্পার। ১৯৫৩তে হিলারি যখন এভারেস্ট conquer করে তখন Lukla পৌঁছাতে তার সময় লেগেছিলো প্রায় একমাস, আর আমরা পৌঁছে গেলাম ৪৫ মিনিটস এর মধ্যেই।

আমাদের ট্রেকিং গাইড এর সাথে পরিচয়ের পর ব্রেকফাস্ট আর চা কফির পর্ব টা শেষ করলাম। তারপরে শুরু হলো সেই কাঙ্খিত পদযাত্রা । Off season হওয়াতে আসে পাশে আর কাউকেই দেখলাম না। শুধু আমরা ১৫ জন হেটে চললাম জঙ্গল, পর্বত সব কিছুর মধ্যে দিয়ে। কিছুক্ষণ পর পরে দৃশ্য বদলে যেতে থাকে, স্থানীও লোকজন মাঝে মাঝে হাত নাড়িয়ে আমাদের শুভকামনা করলো। পর্বত এলাকায় মানুষের জীবন অনেক কঠিন, কাঁধের উপরে ১৫/২০ কিলো ওজন নিয়ে একেক জন খাড়া রাস্তা দিয়ে হেটে চলছে তাদের গন্তব্য স্থলে। একটি অদ্ভুত জিনিস মনকে ছুঁয়ে গেলো - বাচ্চা ছেলে মেয়েরা শুয়ে আছে বাড়ির উঠোনে, পাশে কুকুর শুয়ে আছে তাদের সাথে, অনেকের কোলের উপরে, সামাজিক ভাবে যেন একই তাদের অবস্থান। দুপুর আর রাতের খাবার সারলাম একটি tea house-এ - ডাল, ভাত আর সবজি দিয়ে । যদিও ডাল ভাত আমার প্রিয় খাবার, তবুও একটু মন খারাপ হলো যখন গাইড বললো পরবর্তী ৯/১০ দিন আমাদের এভাবেই চলবে – নো meat। মাংস আসার একমাত্র উপায় কাঠমান্ডু থেকে কারণ পর্বত এলাকায় পশু জবাই নিষিদ্ধ (Buddhist culture). Transport এর সময় মাংস নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে দুরত্ব আর সময়ের জন্য। ডাল ভাতের একটা সুবিধা হচ্ছে সাপ্লাই আন লিমিটেড – যত ইচ্ছা খাওয়া যায় at no extra cost.

প্রথম রাতেই টের পেলাম ঠান্ডা কি জিনিস! স্লিপিং ব্যা গ এর ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করলাম কিন্তু গরম হচ্ছিনা কোনো ভাবেই । সারারাত এপাশ ওপাশ – নতুন জায়গা, অপরিচিত রুম মেট (এক ইন্ডিয়ান ডাক্তার), তারপরে ঠান্ডা! আমার ঘুম এমনিতেই কম, সুতরাং প্রথম রাত বলা যায় এক রকম জেগেই থাকলাম। পরদিন গন্তব্যস্থল Namchi Bazaar - travellers, trekkers আর climbers কাছে এটা হচ্ছে last Shangrila. Namchi Bazaar একটি vibrant টাউন, চারিদিকে Buddhist প্রেয়ার ফ্ল্যাগ গুলো দিয়ে সাজানো কিন্তু ট্রেকিং এর বিবেচনায় একটি অন্যতম কঠিন দিন. তিনটিসাসপেনেশন ব্রিজ আমরা পার হই এই দিন, এর মধ্যে সবচেয়ে দর্শনীয় এবং লংগেস্ট হলো Hillary Suspension Bridge. এই ব্রিজের উপর ঘটে একটি মজার ঘটনা - ছবি

তুলতে তুলতে আমি যখন halfway, তখন লক্ষ্য করি অন্যদিকে থেকে নেমে আসছে Yaak এর দল। আমার তখন option হয় ফিরে যাওয়া বা লেপ্টে থাকা ব্রিজের তারের সাথে যাতে Yaak গুলো আমাকে bypass করে চলে যায়। দ্বিতীয় অপসন টা বেছে নিলাম নাক, কান বন্ধ করে, কিন্তু Yaak এর গন্ধ আর গলার ঘন্টির আওয়াজ এত স্ট্রিং যে নিজেকে মনে হলো ওদেরই অংশ



Namchi Bazaar এ দুইদিন থাকতে হলো altitude-এ অভস্ত হওয়ার জন্য - টেকনিকটা হলো higher altitude-এ পৌঁছানোর পর আবার নিচে নেমে আসা এবং lower altitude-এ ঘূমানো। শরীর এভাবেই এ অভস্ত হয় । সমস্ত ব্র্যান্ডের দোকান এখানে আছে তার সাথে খাবার আর হোটেল, বিকেল বেলায় ১০ ডলার দিয়ে শাওয়ার করলাম, মনে হলো মাথা থেকে একটা ভারী বোঝা নামলো।

এর পরের দিনগুলো কাটলো এভারেস্ট কে সামনে রেখে – যত আগাছি, তত এভারেস্টকে আরো ভালো ভাবে উপলব্ধি করছি। প্রতিদিন আমরা ১০/১২ km করে ট্রেক করছি আর উপরে উঠছি, মাঝে একটা Buddhist Monastery পার হলাম, জায়গাটি এতটাই spiritual, মনে হলো দুইদিন ওখানেই থেকে যাই। চারপাশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এখন জানি কোনো তুলনা নেই, সমস্ত শারীরিক কষ্ট যেন চোখ মেলাতে অনেকটা লাঘব হয়। সমস্ত শারীরিক কষ্ট যেন চোখ মেলাতে অনেকটা লাঘব হয়। গাইড দুইজন সব সময় আমাদেরকে পর্বত গুলো চেনানোর চেষ্টা করতো - পৃথিবীর ১৪ টা সবচে বড় পর্বতের ১০টি এই হিমালয়ান রেঞ্জ এর ভিতরে, আর এরা সবাই ৮০০০ মিটারের উপরে। তবে মাঝে মধ্যে Ama Dablam (6814m) কে দেখে মনে হতো এটা এভারেস্টের চেয়েও উঁচু। কিন্তু কথায় যে বলে দিল্লী দূর অস্ত, এভারেস্টও সেই ব্যাপার।

Lobuche যখন পৌছালাম তখন আমাদের elevation প্রায় ৫০০০ metre sea level এর উপরে, এর মধ্যে পার হয়েছি অদ্ভুত সুন্দর একটি Cemetery । এখানে রয়েছে কিছু শেরপাদের কবর যারা এ পর্যন্ত হিমালয়ান এক্সপেডিশন –এ জীবন হারিয়েছে। একটার পর একটা পাথর সাজিয়ে কবর গুলি পিরামিড এর মতো করা হয়েছে, আর প্রেয়ার ফ্ল্যাগ আর চারদিকের পর্বত মালা যেন এদেরকে পাহারা আর আশীর্বাদ করছে অবিরত । আমার মনে একটাই অনুভব হলো – শেষ বিশ্বামের জন্য এর চেয়ে কোনো ভালো জায়গা হতে পারেনা ।

Altitude sickness এর প্রথম ধাক্কা পেলাম এখানেই, ঘাড়ের কাছে আর মাথার ভিতরে মনে হল একটা shooting

pain। জোরে জোরে নিঃস্বাস নেয়ার চেষ্টা করছি আর একটু একটু পানি মুখে দিয়ে ঢোক গিলছি । গাইড কে বলাতে সে আশ্বস্ত করলো যে এর পরের ২ ঘন্টা আমরা নিচে নেমে যাবো প্রায় ২০০ মিটারের মতো, সুতরাং আমি এখনকার চেয়ে ভালো বোধ করবো । Teahouse টুকে আমার ডাক্তার রুমমেট আমাকে একটা Dexa (steroid) tablet খেতে বললো । যে কোনো ওষুধের প্রতি আমার সব সময় এলার্জি তবে ওর অনুরোধে শেষ পর্যন্ত একটা খেয়ে নিলাম । ফল হলো মারাত্মক –সারা রাত সিলিং এর দিকে চেয়ে আছি, ঘুমের ছিটে ফোটাও চোখে এলোনা। যদিও ব্যাথা আর নাই কিন্তু ঘুম না হওয়াতে মেজাজ আমার তখন চরমে ।

পরদিন আমাদের D Day, গন্তব্যের এতো কাছে এসে মেজাজ ঠিক রাখা আরো জরুরি । তাই যতই খারাপ লাগছিলো ট্রেকিং এর সময় , মনে ততই উৎফুল্ল ভাব নিয়ে আসলাম। ট্রেকিং এর দিক থেকে এটা দ্বিতীয় কঠিনতম দিন , terrain হচ্ছে খুবই rocky, তাই trekking pole ব্যবহার করে প্রতিটা স্টেপ এগোতে থাকলাম – one step one breath – এতো উচ্চতায় বাতাসের প্রেসার কম (প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ) । তাই তাড়া হড়া করা মানে মূল্যবান এনার্জি খরচ করা – মাউন্টেন এনভিরনমেন্টে শরীর থেকে যেটা সবচে দরকার তাহলো Endurance – sustained energy – ফিটনেস থাকতে হবে সেটা অফকোর্স কিন্তু Endurance না থাকলে বেশিদিন টেকা যাবে না। একবার অসুস্থ হওয়া মানেই সব কিছুর সমাপ্তি – হেলিকপ্টারে করে সোজা back to Kathmandu।

অবশেষে বেস ক্যাম্প এর দেখা মিললো – প্রায় ১০০ মিটার নিচে প্রেয়ার ফ্ল্যাগ দেখা যাচ্ছে, আমরা উত্তেজনায় প্রায় লাফিয়ে যেতে চাইলাম কিন্তু পারলাম না পাথরের জন্য। বেস ক্যাম্পে এসে ক্লাইম্বাররা সেটল করে কিছু দিনের জন্য যাতে সামনের কঠিনতম দিনগুলোকে tackle করা যায়। কিন্তু আমরা কোনো ক্যাম্প দেখলাম না কারণ এখন অফ সিজন। আমাদের গ্রুপের সবাই দাঁড়িয়ে গেলো একটা বড়ো পাথরের উপর ছবি তোলার জন্য , আমি খুঁজতে থাকলাম পাথরের নিচে কোনো Bangladesh-এর ফ্ল্যাগ পাওয়া যায় কেনা। শেষ পর্যন্ত একটা Australian ফ্ল্যাগ পেলাম যেটা জড়িয়ে কিছু ছবি তুললাম। আমরা তখন এভারেস্টের সবচে কাছে কিন্তু সরাসরি চূড়া দেখা একটু কষ্টকর তবুও ক্যাম্প ১ এর ট্রেকটা ম্পষ্ট দেখা যাচ্ছে Khumbu Glacier-এর উপর , কেন জানি একটু শিউরে উঠলাম এক অজানা আতঙ্কে।

বেস ক্যাম্পে ঘন্টা খানেক সময় কাটানোর পর আবার শুরু হলো ২ঘন্টা ধরে ট্রেকিং, teahouse-এ পৌঁছে জিনজারটি খেয়ে শুরু করলাম কালাপাথর ক্লাইম্বিং (প্রায় ৪০০ মিটার উঁচু)। এখন থেকে পরিষ্কার সূর্যাস্ত দেখা যায় পুরো হিমালয়ান রেঞ্জ এর উপরে। সেএক অসাধারণ অভিজ্ঞতা – মনে হচ্ছে এভারেস্ট on fire. আর ওদিকে টেম্পারেচার ড্রপ করছেexponentially, চোখের পাতা দুটো মনে হচ্ছে বরফ হয়ে যাবে।

পরের তিন দিন গেলো আমাদের নামতে – যদিও ৫৮০০ মিটার উঠেছিলাম ৭ দিনে।